ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল। (১৩৮) বস্তুত আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনি ইসরাঈলদের। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল। বলতে লাগল, হে মূসা! আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। (১৩৯) এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা যে ভুল! (১৪০) তিনি বললেন, তাহলে কি আল্লাহ্‌কে ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (১৪১) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের ফিরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি; তারা তোমাদের দিত নিকৃষ্ট শাস্তি, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের মেরে ফেলত এবং মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত। এতে তোমাদের প্রতি তোমাদের পরওয়ার-দিগারের বিরাট পরীক্ষা রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে জলমগ্ন করে) আমি সেসব লোককে যারা দুর্বল বলে পরিগণিত হত (অর্থাৎ বনি ইসরাঈলকে) সে ভূমির পূর্ব ও পশ্চিমের (অর্থাৎ সব দিকের) মালিক বানিয়ে দিয়েছি—যাতে আমি বরকত রেখেছি। [বাহ্যিক বরকত হল ফল-ফসলের অধিক উৎপাদন। আর অভ্যন্তরীণ বরকত হল আম্বিয়া (আ) ও বহু সাধক মনীষীবৃন্দের আবাসভূমি ও সমাধিস্থান হিসেবে]। আর আপনার পর-ওয়ারদিগারের উত্তম ওয়াদা বনি ইসরাঈলদের পক্ষে তাদের ধৈর্যের দরুন পূর্ণ করা হয়েছে। [যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল اصبروا (ইস্‌বিরু) বলে]। আর আমি ফিরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের নির্মিত, প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় কীর্তি এবং তারা যেসব সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী করেছিল সে সবগুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছি। বস্তুত (যে সাগরে ফিরাউনকে নিমজ্জিত করা হয়েছে) আমি বনি ইসরাঈলদের তা পার করে দিয়েছি (যে কাহিনী সূরাহ শুআরায় বর্ণিত রয়েছে)। অতপর (সে সাগর পাড়ি দেবার পর) তারা (এমন) এক জাতি (জনপদ) অতিক্রম করল, যারা কতিপয় মূর্তিকে জড়িয়ে বসেছিল (অর্থাৎ তারা সেগুলোর পূজা-পাট করছিল)। বলতে লাগল, হে মূসা! আমাদের জন্যও এমনি একজন (শরীরী) উপাস্য নির্ধারিত করে দিন, যেমন ওদের এই উপাস্যগুলো। তিনি বললেন, বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে কঠিন মূর্খতা বিদ্যমান। এরা যে কাজে লিপ্ত (তাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) ধ্বংস করে দেওয়া হবে (যেমন, আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি রয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর জয়ী করে তাবৎ মিথ্যা ধ্বংস করে দিয়ে থাকেন)। তাছাড়া তাদের এ কাজটি ভিত্তিহীনও বটে। (কারণ, শির্‌ক বা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা যে নিতান্ত অবৈধ, একথা নিশ্চিত ও স্পষ্ট)। তিনি (আরও) বললেন, আল্লাহ্‌ ছাড়া কি অপর কোন কিছুকে তোমাদের উপাস্য করে দেব, অথচ তিনি তোমাদের (কোন কোন নিয়ামতের দিক

দিয়ে) সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদা দান করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র বক্তব্যের সমর্থনকল্পে বললেন ঃ সে সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের ফিরাউনের সহচরদের অন্যায় অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম অথচ তারা তোমাদের ভীষণ কষ্ট দিত। তোমাদের পুত্রদের নির্বিচারে হত্যা করত আর তোমাদের কন্যাদের নিজেদের বেগার খাটার জন্য এবং সেবার জন্যে জীবিত রাখত। বস্তুত এ ঘটনাতে তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে অতি কঠিন পরীক্ষা নিহিত ছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ফিরাউন সম্প্রদায়ের ক্রমাগত ঔদ্ধত্য এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে তাদের সতর্কীকরণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। অতপর উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাদের অশুভ পরিণতি এবং বনি ইসরাঈলদের বিজয় ও কৃতকার্যতার আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ- وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا অর্থাৎ যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হতো, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।

কোরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে "যে জাতিকে ফিরাউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল," বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, 'যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল'। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও দুর্বল হয় না। যদিও কোন সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে। কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্রই হাতে।

تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

আর যমীনের মালিক বানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে أَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'ওয়ারেস' বা উত্তরাধিকারী যেমন করে নিজের পূর্ব পুরুষের সম্পদের অধিকারী হয় এবং পিতার জীবদ্দশায়ই সবাই একথা জেনে নিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ধনসম্পদের মালিক

তাঁর সন্তানরাই হবে, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র জানা মতে বনী ইসরাঈলরা পূর্ব থেকেই কওমে ফিরাউনের ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল।

مَشَارِقَ শব্দটি مَشْرِقٌ-এর বহুবচন। আর مَغَارِبَ হচ্ছে مَغْرِبٌ এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে 'মাশারিক' (উদয়াচলসমূহ) এবং 'মাগারিব' (অস্তাচলসমূহ) বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও যমীন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে—যাতে আল্লাহ্ তা'আলা কওমে-ফিরাউন ও কওমে-আ'মালেকাহ্‌কে ধ্বংস করার পর বনী ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।

আর اَلَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا বলে এ কথাও ব্যক্ত করে দিয়েছেন যে, এই ভূমিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ বরকত ও আশীর্বাদ নাযিল করেছেন। শাম বা সিরিয়া সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনেরই বিভিন্ন আয়াতে তার বরকতময় স্থান হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। اَلَّتِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ তেও এ কথাই বলা হয়েছে। এমনিভাবে মিসরভূমির অসাধারণ উর্বরতা বরকতময়তাও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এবং প্রত্যক্ষতার দ্বারা প্রমাণিত হয়। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেছেন, "মিসরের নীল দরিয়া হলো নদীসমূহের সর্দার"। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন যে, বরকতের দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে মিসরে আর বাকি এক ভাগ রয়েছে সমগ্র ভূভাগে।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

সারকথা, যে জাতি অহংকার ও ঔদ্ধত্যে নেশাগ্রস্ত, সে জাতি নিজেদের সংকীর্ণতার দরুন অপর জাতিকে হীন ও দুর্বল মনে করে রেখেছিল, আমি তাদেরকেই সেই উদ্ধত অহংকারীদের ধনসম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানিয়ে প্রতীয়মান করেছি যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলদের ওয়াদা অবশ্যই সত্য হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে ঃ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ অর্থাৎ আপনার পরওয়ারদিগারের ভাল ও মঙ্গলজনক ওয়াদা বনী ইসরাঈলদের অনুকূলে পূর্ণ হয়েছে।

এই ভাল বা মঙ্গলজনক ওয়াদা বলতে হয় عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الارض অর্থাৎ 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে নিধন করে তোমাদের তাদের ভূমির মালিক বানিয়ে দেবেন' বলে হযরত মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা বোঝানো হয়েছে। অথবা কোরআনের

অন্যত্র স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, সেটিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ -

অর্থাৎ আমি চাই সে জাতির প্রতি সহায়তা দান করতে, যাকে এ দেশে হীন ও দুর্বল বলে মনে করা হয়েছে। আর তাদেরকেই সর্দার ও শাসক বানিয়ে দিতে ; তাদেরকেই এ জমির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করতে এবং এই জমিতে তাদেরকেই এ হস্তক্ষেপের অধিকার দান করতে চাই। পক্ষান্তরে ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সেনাকে সে বিষয়টি অনুষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিতে চাই, যার ভয়ে ওরা মূসা (আ)-র বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা করে চলছে।

প্রকৃতপক্ষে এতদুভয় ওয়াদাই এক। আল্লাহ্র ওয়াদার ভিত্তিতেই মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে ওয়াদা করেছিলেন। এ আয়াতে সে ওয়াদা- পূরণের কথা نَمُنَّ শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ ওয়াদার সমাপ্তি বা পূর্ণতা তখনই হয়, যখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়।

এরই সঙ্গে বনী ইসরাঈলের প্রতি এই দান এবং অনুগ্রহের কারণ ব্যক্ত করে দিয়েছেন بِمَا صَبَرُوْا বলে। অর্থাৎ যেহেতু তারা আল্লাহ্র পথে কষ্ট সয়েছে এবং তাতে অটল রয়েছে।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমার এই দান ও অনুগ্রহ শুধু বনী ইসরাঈল-দের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না বরং তা ছিল তাদের সবর ও দৃঢ়তার ফলশ্রুতি। যে ব্যক্তি কিংবা জাতিই এরূপ করবে, স্থান-কাল-নির্বিশেষে তার জন্য আমার এ দান ও অনুগ্রহ বিদ্যমান থাকবে।

قضائے بدر پیدا کرکہ فرشتے تیری نصرت کو
اترسکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

হযরত মূসা (আ) যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তখনও তিনি জাতিকে এ কথাই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং একান্ত দৃঢ়তার সাথে বিপদাপদের মুকাবিলা করাই কৃতকার্যতার চাবিকাঠি।

হযরত হাসান বস্‌রী (র) বলেছেন—এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যদি এমন কোন লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হল তার মুকাবিলা না করে, বরং সবর করা। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উৎপীড়নের মুকাবিলা উৎপীড়নের মাধ্যমে করে অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের উপর ছেড়ে দেন। তাতে সে কৃতকার্য হোক, কি অকৃতকার্য হোক—সে ব্যাপারে তাঁর কোন দায়িত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যখন কোন লোক মানুষের উৎপীড়নের মুকাবিলা ধৈর্য বা সবর এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করে, তখন আল্লাহ্ স্বয়ং তার জন্য পথ খুলে দেন।

আর যেভাবে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের সাথে তাদের সবর ও দৃঢ়তার প্রেক্ষিতে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদেরকে শত্রুর উপর বিজয় এবং যমীনের উপরে শাসন-ক্ষমতা দান করবেন, তেমনিভাবে মহানবী (সা)-র উম্মতের প্রতিও ওয়াদা করেছেন।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

আর যেভাবে বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ্‌র ওয়াদা প্রত্যক্ষ করেছিল, মহানবী (সা)-র উম্মতরা তার চেয়েও প্রকৃষ্টভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছে; সমগ্র বিশ্বে তাদের শাসন ও রাষ্ট্রকে ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে।—(রাহুল-বয়ান)

এখানে এ প্রশ্ন করা যায় না যে, বনী ইসরাঈলরা তো ধৈর্যের সাথে কাজ করেনি বরং মূসা (আ) যখন ধৈর্যের উপদেশ দেন, তখন রুষ্ট হয়ে বলে উঠল : اُوْذِيْنَا

সব সময়ই আমরা দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন রয়েছি। তার কারণ, প্রথমত ফিরাউনের উৎপীড়নের মুকাবিলায় তাদের ধৈর্য এবং ঈমানের উপর তাদের দৃঢ়তা সর্বক্ষণই প্রতীয়-মান। যদি কখনও হঠাৎ একআধটা অনুযোগ বেরিয়েও যায়, তবে তা ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়ত এমনও হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলদের এ কথাটি অভিযোগ অনুযোগ ছিলই না, বরং দুঃখ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেও বলে থাকতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে অতপর বলা হয়েছে : وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ-

فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ অর্থাৎ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি সে সমস্ত বস্তু, যা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় তৈরী করে থাকত এবং সেই প্রাসাদ ও বৃক্ষরাজি যেগুলোকে তারা উঁচিয়ে তুলত। ফিরাউন ও ফিরাউনের সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে ঘরবাড়ি, দালান-কোঠা, ব্যবহার্য আসবাবপত্র এবং মূসার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদি

প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত। আর وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ অর্থাৎ যা কিছু তারা উঁচিয়ে তুলত। এতে উচ্চ প্রাসাদ এবং দালান-কোঠাও যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে বড় বড় বৃক্ষরাজি এবং আঙুরের লতা যা মাচা দিয়ে ছাদের উপর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হত—এসবও অন্তর্ভুক্ত।

এ পর্যন্ত ছিল কওমে-ফিরাউনের ধ্বংসের আলোচনা। তারপর থেকে শুরু হচ্ছে বনী ইসরাঈলের বিজয় ও কৃতকার্যতা লাভের পর তাদের ঔদ্ধত্য, মূর্খতা ও দুষ্কর্মের বিবরণ, যা আল্লাহ্‌র অসংখ্য নিয়ামত প্রত্যক্ষ করার পরেও তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, রসূলুল্লাহ্‌কে সান্ত্বনা দান যে, পূর্ববর্তী রসূলরাও স্বীয় উম্মতের দ্বারা ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন। সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে বর্তমান ঔদ্ধত্য ও উৎপীড়ন কিছুটা লাঘব হয়ে যাবে।

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ- অর্থাৎ আমি বনী ইসরাঈলদের সাগর পার করে দিয়েছি।

ঘটনাটি হলো এই যে, এই জাতি মূসা (আ)-র মু'জিযা বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফিরাউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে বনী ইসরাঈলদেরও তাদের সে রীতি-নীতিই পছন্দ হতে লাগল। তাই মূসা (আ)-র নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোন একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে ইবাদত-উপাসনা করতে পারি; আল্লাহ্‌র সত্তা তো আর সামনে আসে না। মূসা আলাইহিস্‌সালাম বললেন: إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে বড় মূর্খতা রয়েছে। যাদের রীতি-নীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল যে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে! এরা মিথ্যার অনুগামী। ওদের এসব ভ্রান্ত রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদের দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ, তখন মূসা (আ)-র উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশি মর্যাদাসম্পন্ন ও উত্তম।

অতপর বনী ইসরাঈলদের তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফিরাউনের কওমের হাতে তারা এমনই অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের

ছেলেদের হত্যা করে নারীদের অব্যাহতি দেওয়া হতো সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ মূসা (আ)-র বদৌলতে এবং তাঁর দোয়ার বরকতে তাদেরকে সে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল-আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতর পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এ যে মহা জুলুম। এর থেকে তওবা কর।

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ
اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ
وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

(১৪২) আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুত এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[আর বনী ইসরাঈলরা যখন যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হল, তখন মূসা (আ)-র নিকট আবেদন জানাল যে, এখন যদি আমরা কোন শরীয়ত প্রাপ্ত হই, তাহলে নিশ্চিন্ত মনে সেমতে কাজ করতে পারি। তখন মূসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করলেন। আল্লাহ্ সে কাহিনীই এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,] আমি মূসা (আ)-কে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করলাম (যাতে তিনি তূর পর্বতে এসে ই'তিকাফ করেন। তখনই তাঁকে শরীয়ত এবং তওরাত গ্রন্থ দেওয়া হবে।) আর ত্রিশ রাত্রির উপ-সংহারে আরও দশ রাত্রি বাড়িয়ে দিলাম। অর্থাৎ তওরাত দান করে তাতে আরও দশটি রাত্রি ইবাদতের জন্য বাড়িয়ে দিলাম, যার কারণ সূরা বাকারায় বর্ণিত রয়েছে। এভাবে তাঁর পরওয়ারদিগারের (নির্ধারিত) সময় (সব মিলে) চল্লিশ রাত্রি পূর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা (আ) যখন তূর পর্বতে আসতে লাগলেন, তখন স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আ)-কে বললেন, আমার পরে আপনি এদের ব্যবস্থা নেবেন এবং তাদের সংশোধন করতে থাকবেন। আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের পথ অবলম্বন করবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলের সেই ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে, যা ফিরাউনের জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে বনী ইসরাঈলদের নিশ্চিন্ত হওয়ার পর সংঘ-টিত হয়েছিল। বলা হয়েছে যে, তখন বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ)-র নিকট

আবেদন করেছিল যে, এখন আমরা নিশ্চিন্ত। এবার যদি আমাদের কোন কিতাব এবং শরীয়ত দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চিন্ত মনে সে মতে আমল করতে পারি। তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন।

এতে وَاعَدْنَا শব্দটি وعد (ওয়াদাহ্) থেকে উদ্ভূত। আর ওয়াদার তাৎপর্য হল এই যে, কাউকে লাভজনক কোন কিছু দেবার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেওয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র প্রতি স্বীয় কিতাব নাযিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, মূসা (আ) ত্রিশ রাত তূর পর্বতে ইতিকাফ ও আল্লাহ্র ইবাদত-আরাধনায় অতিবাহিত করবেন। অতপর এই ত্রিশ রাতের উপর আরও দশ রাত বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন।

وَاعَدْنَا -শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর পক্ষ থেকে ছিল তওরাত দানের প্রতিশ্রুতি; আর মূসা (আ)-র পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত যাবত ইতিকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই وَعَدْنَا না বলে وَاعَدْنَا বলা হয়েছে।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় ও নির্দেশ লক্ষণীয়।

প্রথমত, চল্লিশ রাত ইতিকাফ করানোই যখন আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল, তখন প্রথমে ত্রিশ এবং পরে দশ বৃদ্ধি করে চল্লিশ করার তাৎপর্য কি? একত্রেই চল্লিশ রাতের ইতিকাফের হুকুম দিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল? আল্লাহ্র হিকমতের সীমা-পরিসীমা কে জানবে! তবুও আলিম সমাজ এর কিছু কিছু হিকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

তফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, এর একটি তাৎপর্য হল ক্রমধারা সৃষ্টি করা। যাতে কোন কাজ কারো দায়িত্বে অর্পণ করতে হলে, প্রথমেই তার উপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি করা না হয়; বরং ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে যেন বাড়ানো হয়, যাতে সে সহজে তা পালন করতে পারে। তারপর অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা।

তফসীরে কুরতুবীতে আরও বলা হয়েছে যে, এভাবে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদের শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, কাউকে যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজের বা বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় আর সে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে আরও সময় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, মূসা (আ)-র সাথে হয়েছে —ত্রিশ রাতে যে অবস্থা লাভ উদ্দেশ্য ছিল তা যখন পূর্ণ হয়নি, তখন অতিরিক্ত দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ, এই দশ রাত বৃদ্ধির ব্যাপারে তফসীরকার-গণ যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে, ত্রিশ রাতের ইতিকাফের সময়

হযরত মূসা (আ) নিয়মানুযায়ী ত্রিশটি রোযাও রেখেছেন, কিন্তু মাঝে কোন ইফতার করেন নি। ত্রিশ রোযা শেষ করার পর ইফতার করে তূর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে হাযির হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হলো যে, রোযাদারের মুখ থেকে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের বাষ্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট অতি পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মেসওয়াক করে সে গন্ধ দূর করে দিয়েছেন কাজেই আরও দশটি রোযা রাখুন যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়।

কোন কোন তফসীর-সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত আছে যে, ত্রিশ রোযার পর হযরত মূসা (আ) মেসওয়াক করে ফেলেছিলেন, যার ফলে রোযাজনিত মুখের গন্ধ চলে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় না যে, রোযাদারের জন্য মেসওয়াক করা অনুত্তম বা নিষিদ্ধ। কারণ, প্রথমত এই রেওয়ায়েতের কোন সনদ নেই। দ্বিতীয়ত এমনও হতে পারে যে, এ হুকুমটি ব্যক্তিগতভাবে শুধু মূসা (আ)-রই জন্য; সাধারণ নির্দেশ নয়। অথবা মূসা (আ)-র শরীয়তে এ ধরনের হুকুম হয়তো সবারই জন্য ছিল যে, রোযার সময় মেসওয়াক করা যাবে না। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদীয়া বা মহানবী (সা)-র শরীয়তে রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করার প্রচলন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, যা বায়হাকী হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ - خير خصا ئل الصيام السواك অর্থাৎ রোযাদারের সর্বোত্তম কাজ হল মেসওয়াক করা। এই রেওয়ায়েতটি জামেউস্‌-সগীরে উদ্ধৃত করে একে 'হাসান' বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আ) হযরত খিযিরের সন্ধানে যখন সফর করছিলেন, তখন যে ক্ষেত্রে অর্ধ দিনের ক্ষুধাতেও ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি এবং নিজের ভ্রমণসঙ্গীকে বলেছেন যে, اٰتِنَا غَدَاۤءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا অর্থাৎ আমাদের নাশ্‌তা বের কর। কারণ, এ ভ্রমণ আমাদের পরিশ্রান্তির সম্মুখীন করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তূর পর্বতে ক্রমাগত এমনভাবে ত্রিশ রোযা করা যাতে রাতের বেলায়ও কোন ইফতার করা যাবে না---- বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি?

তফসীরে রূহুল-বয়ানে বর্ণিত আছে যে, এই পার্থক্যটা ছিল এতদুভয় সফরের প্রকৃতির পার্থক্যের দরুন। প্রথমোক্ত সফরের সম্পর্ক ছিল সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির। পক্ষান্তরে তূর পর্বতের এই সফর ছিল সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে মহান পরওয়ার-দিগারের অন্বেষায়। এমন একটি মহৎ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর জৈবিক চাহিদা এমন স্তিমিত হয়ে গেছে এবং পানাহারের প্রয়োজনীয়তা এত কমে গেছে যে, ত্রিশ রোযা পর্যন্ত কোন কষ্টই তিনি অনুভব করেন নি।

ইবাদতের বেলায় চান্দ্র হিসাব ও পার্থিব ব্যাপারে সৌর হিসাবের অবকাশঃ আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী-রসূলদের শরীয়তে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ, এ আয়াতেও ত্রিশ দিনের স্থলে ত্রিশ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, নবী-রসূলদের শরীয়তে চান্দ্রমাস গ্রহণীয়। আর চান্দ্রমাস শুরু হয় চাঁদ দেখা থেকে এবং তা রাতের বেলাতেই হতে পারে। সেজন্যই মাস শুরু হয় রাত থেকে এবং তার প্রতিটি তারিখের গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে। আসমানী যত ধর্ম রয়েছে সে সবগুলোর হিসাবই এভাবে চান্দ্রমাস থেকে এবং তারিখের গণনা সূর্যাস্ত থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইবনে-আরাবীর বরাতে কুরতুবী উদ্ধৃত করেছেন যে, حساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسک অর্থাৎ সৌর হিসাব হলো পার্থিব লাভের জন্য; আর চান্দ্র হিসাব হলো ইবাদত-উপাসনার জন্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর তফসীর অনুসারে এই ত্রিশ রাত্রি ছিল যিলক্বদ মাসের রাত্রি; আর এরই উপর যিলহজ্জ মাসের দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত মূসা (আ) তওরাতের উপঢৌকনটি লাভ করেছিলেন কুরবানীর দিনে।-----(কুরতুবী)

আত্মশুদ্ধিতে ৪০ দিনের বিশেষ তাৎপর্যঃ এ আয়াতের ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে লোক ৪০ দিন নিঃস্বার্থতার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, আল্লাহ্ তার অন্তর থেকে জ্ঞান ও হিকমতের ঝরনাধারা প্রবাহিত করে দেন। -----(রূহুল বয়ান)

মানুষের প্রতি সকল কাজে ধীর-স্থিরতা ও ক্রমান্বয়ের শিক্ষাঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে নেওয়া এবং তা ধীর-স্থিরতার সাথে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমাধা করা আল্লাহ্ তা'আলার রীতি। কোন কাজে তাড়াহুড়া করা আল্লাহ্র পছন্দ নয়।

সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাজের জন্য অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি উপলক্ষে ছয় দিনের সময় নির্ধারণ করে এ নিয়মটিই বাতলে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্র পক্ষে আসমান-যমীন তথা সমগ্র বিশ্বজাহান সৃষ্টির জন্য এক মিনিট সময়েরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তিনি যখনই কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। কিন্তু সময় নির্ধারণের এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টিকে এ হিদায়ত দানই ছিল উদ্দেশ্য যে, তোমরা প্রতিটি কাজ একান্ত বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ধীর-স্থিরভাবে সমাধা করবে। তেমনিভাবে মূসা (আ)-কে তওরাত দান করার জন্যও যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাতেও সে ইঙ্গিতই রয়েছে।

আর এই হল সে রীতি, যাকে উপেক্ষা করার দরুন বনি ইসরাঈলদের গোমরাহীর সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সাবেক হুকুম অনুসারে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, আমি ত্রিশ দিনের জন্য যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে যখন দশ দিনের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন এরা নিজেদের তাড়াহুড়ার দরুন বলতে শুরু করে যে, মূসা তো কোথাও হারিয়েই গেছেন। কাজেই আমাদের অপর কোন নেতা নির্ধারণ করে নেওয়াই উচিত। তার ফলে তারা সহসাই 'সামেরী'-র ফাঁদে আটকে গিয়ে 'বাছুর'-এর পূজা করতে শুরু করে দেয়। তারা যদি চিন্তা-ভাবনা এবং নিজেদের কাজে ধীরস্থিরতা ও পর্যায়ক্রমিকতা অবলম্বন করত, তাহলে এহেন পরিণতি হত না।---কুরতুবী।

আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটিতে বলা হয়েছেঃ وَقَالَ مُوسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ এই বাক্য থেকেও কয়েকটি বিষয় ও আহ্কাম উদ্ভাবিত হয়।

প্রয়োজনবশত স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণঃ প্রথমত, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা অনুসারে তূর পর্বতে গিয়ে যখন ইতেকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় সঙ্গী হযরত হারূন (আ)-কে বললেন, اُخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ অর্থাৎ আমার পেছনে বা অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করুন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোন লোক নিয়োগ করে যাওয়া কর্তব্য।

আরও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন কোথাও সফরে যাবেন, তখন নিজের কোন লোককে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবেন।

রসূলে করীম (সা)-এর সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনও যদি তাঁকে মদীনার বাইরে যেতে হত, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি হযরত আলী মুর্তজা (রা)-কে খলীফা বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাক্তুম (রা)-কে খলীফা নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী (রা)-কে মদীনায় খলীফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন।---কুরতুবী।

মূসা (আ) হারূন (আ)-কে খলীফা নিযুক্ত করার সময় তাঁকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয়

নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এই হিদায়ত বা নির্দেশাবলীর মধ্যে প্রথম নির্দেশ হল اَصْلِحْ এখানে اصلح -এর কোন কর্ম উল্লেখ করা হয়নি যে, কার ইসলাহ্ বা সংশোধন করা হবে। এতে বোঝা যায় যে, নিজেরও ইসলাহ্ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়েরও ইসলাহ্ করবেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে দাঙ্গা-ফাসাদজনিত কোন বিষয় আঁচ করতে পারলে তাদেরকে সরল পথে আনার চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় হিদায়েত দেওয়া হলো এই যে, لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ দাঙ্গা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলা বাহুল্য, হারূন (আ) হলেন আল্লাহ্র নবী, তাঁর নিজের পক্ষে ফাসাদে পতিত হওয়ার কোন আশংকাই ছিল না। কাজেই এই হিদায়েতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন সাহায্য-সহায়তা করবেন না।

সুতরাং হযরত হারূন (আ) যখন দেখলেন, তাঁর সম্প্রদায় 'সামেরী'-র অনুগমন করতে শুরু করেছে, এমনকি তার কথামত 'বাছুরের' পূজা করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তাঁর সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামি থেকে বাধা দান করলেন এবং সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতপর ফিরে এসে হযরত মূসা (আ) যখন ধারণা করলেন যে, হারূন (আ) আমার অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তাঁর প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন।

হযরত মূসা (আ)-র এ ঘটনা থেকে সেসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা অব্যবস্থা এবং নিশ্চিন্ততাকেই সবচেয়ে বড় বুযুর্গী বলে মনে করে থাকেন।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ
اِلَيْكَ ۭ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ
مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ
خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا
اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ
بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۡ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝
وَكَتَبْنَا لَهٗ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ

شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُمْ
دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

(১৪৩) তারপর মূসা যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর পরওয়ারদিগার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তাঁর পরওয়ারদিগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অতপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; বললেন, হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি। (১৪৪) (পরওয়ারদিগার) বললেন, হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। (১৪৫) আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদের দেখাব কাফিরদের বাসস্থান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন মূসা (আ) (এই ঘটনায়) আমার (ওয়াদাকৃত) সময়ে এসেছিলেন (যার বর্ণনা করা হচ্ছে), তাঁর পরওয়ারদিগার তাঁর সাথে (বিশেষ অনুগ্রহ ও সদয়) কথা-বার্তা বললেন (এবং আগ্রহের প্রবলতায় দর্শন লাভের আগ্রহ সৃষ্টি হল) তখন নিবেদন করলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে তোমার দীদার (বা দর্শন) দান কর, যাতে আমি তোমাকে (একটিবার) দেখতে পাই। (তখন) ইরশাদ হল, তুমি আমাকে (এ পৃথিবীতে) কস্মিনকালেও দেখতে পারবে না। (কারণ, তোমার এ চোখ প্রভুর সৌন্দর্যের জ্যোতি সহ্য করতে পারবে না। যেমন, মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতিতে মিশ্‌কাতে বর্ণিত হয়েছে- لاحرقت سبحات وجهه) কিন্তু (তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে,) তুমি এ পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, আমি এর উপর একটি ঝলক ফেলছি, এতে যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে (যা হোক) তুমিও দেখতে পারবে। অতএব, মূসা (আ) সেদিকে দেখতে থাকলেন। বস্তুত তাঁর পরওয়ারদিগার যেইমাত্র এর উপর তাজাল্লী নিক্ষেপ করলেন, সে আলোকচ্ছটা সে পাহাড়কে ছিন্নভিন্ন করে দিল এবং মূসা (আ) অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর যখন চেতনা পেলেন, তখন

নিবেদন করলেন, নিশ্চয়ই আপনার সত্তা (এই চোখের সহ্যশক্তি থেকে) পবিত্র (ও উর্ধ্বে) আমি আপনার দরবারে (এই সাগ্রহ নিবেদনের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং (আপনার যে বাণী لَنْ تَرَانِيْ--তার প্রতি) সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি।

ইরশাদ হলোঃ হে মূসা, আমি (তোমাকে) নিজের পক্ষ থেকে নবুয়ত (-এর পদমর্যাদা দিয়ে) এবং আমার সাথে কথোপকথনের (সম্মান দানের) মাধ্যমে অন্যান্য লোকের উপর তোমাকে বিশিষ্টতা দিয়েছি (তাই যথেষ্ট)। কাজেই (এখন) তোমাকে যা কিছু দান করেছি (অর্থাৎ রিসালত, আমার সাথে কথোপকথন ও তওরাত) তা গ্রহণ কর এবং শুকরিয়া আদায় কর। আর আমি কয়েকটি তখতীর উপর (প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলীও) যাবতীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ তাদেরকে লিখে দিয়েছি। (এই তখতীগুলো যখন আমি দিয়েছি) কাজেই তাতে মনোনিবেশ সহকারে (নিজেও) আমল কর এবং নিজ সম্প্রদায়কেও বল, যাতে (তারা) তার ভাল ভাল নির্দেশসমূহ অনুযায়ী (অর্থাৎ তার সমস্ত নির্দেশের উপর যথাযথভাবে) আমল করে। আমি এবার শীঘ্রই তোমাদের (অর্থাৎ বনি ইসরাঈলদের) সেই হুকুম লংঘনকারীদের (অর্থাৎ ফিরাউনী বা আমালেকাদের) স্থান দেখাচ্ছি। (এতে মিসর বা সিরিয়ার উপর যথাশীঘ্র বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অধিকার বিস্তারের সুসংবাদ এবং প্রতিশ্রুতি দান করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, বনি ইসরাঈলদের আনুগত্য ও ঐশী নির্দেশাবলী পালনের যে বরকত ও মহিমা রয়েছে, তার প্রতি উৎসাহিত করা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَنْ تَرَانِيْ (অর্থাৎ আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না)। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দর্শন যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু যার প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে [অর্থাৎ মূসা (আ)] বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হতো, তাহলে لَنْ تَرَانِيْ না বলে বলা হত, لَنْ أُرَى 'আমার দর্শন হতে পারে না'।—মাযহারী।

এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এটাই হল অধিকাংশ আহলে সুন্নাহ্‌র মত যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে— لن يرى احد منكم ربه حتى يموت অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার পরওয়ারদিগারকে দেখতে পারবে না।

وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ—এতে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায়

শ্রোতা আল্লাহ্‌র দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর যৎসামান্য ছটা বিকিরণ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাও তোমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর নয়। মানুষ তো একান্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি; সে তা কেমন করে সহ্য করবে?

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ—আরবী অভিধানে تَجَلّٰى অর্থ প্রকাশিত হওয়া ও বিকশিত হওয়া। সূফী সম্প্রদায়ের পরিভাষায় 'তাজাল্লী' অর্থ হলো কোন বিষয়কে কোন কিছুর মাধ্যমে দেখা। যেমন, কোন বস্তুকে আয়নার মাধ্যমে দেখা হয়। সেজন্যই তাজাল্লীকে দর্শন বলা যায় না। স্বয়ং এ আয়াতেই তার সাক্ষ্য বর্তমান যে, আল্লাহ্ তা'আলা দর্শনকে বলেছেন অসম্ভব আর তাজাল্লী বা বিকশিত হওয়াকে তা বলেন নি।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম হযরত আনাস (রা)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী ও হাকেম-এর সনদকে যথার্থ বলেও উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে পাহাড় পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড়ই যে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে হবে তা অপরিহার্য নয়, বরং পাহাড়ের যে অংশে আল্লাহ্‌র তাজাল্লী বিকিরিত হয়েছিল সে অংশটিই হয়তো প্রভা'বিত হয়ে থাকবে।

হযরত মূসা (আ)-র সাথে আল্লাহ্‌র কালাম বা বাক্য বিনিময়ঃ এ বিষয়টি তো কোরআনের প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-র সাথে সরাসরিই বাক্যবিনিময় করেছেন। এ কালামের মধ্যে রয়েছে প্রথমত সেসব কালাম যা নবুয়ত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়ত সেসব কালাম, যা তওরাত দানকালে হয়েছে এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আয়াতের শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কালাম বা বাক্যবিনিময় প্রথম পর্যায়ের কালামের তুলনায় ছিল কিছুটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ কালামের তাৎপর্য কি ছিল এবং তা কেমন করে সংঘটিত হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কেউই জানতে পারে না। তবে এতে শরীয়তের পরিপন্থী নয়, এমন যত রকম যৌক্তিক সম্ভাব্যতা থাকতে পারে, সেগুলোর কোন একটিকে বিনা প্রমাণে নির্দিষ্ট করা জায়েয হবে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সাহাবী-তাবেঈদের মতামতই সবচাইতে উত্তম যে, এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেওয়া এবং নানা ধরনের সম্ভাব্যতা খুঁজে বেড়ানোর পেছনে না পড়াই বাঞ্ছনীয়।—বয়ানুল-কোরআন—

سَاُورِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ এ ক্ষেত্রে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ কি? এতে দুটি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ, হযরত মূসা (আ)-র বিজয়ের পূর্বে মিসরে ফিরাউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল শাসক ও প্রবল। এ হিসাবে

মিসরকে 'দারুল-ফাসেকীন' বা পাপাচারীদের আবাসস্থল বলা যায়। আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালিকা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওরাও ছিল ফাসিক বা পাপাচারী, সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসিকদেরই আবাসভূমি। এতদুভয় অর্থের কোন্‌টি যে এখানে উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তার ভিত্তি হল এই যে, ফিরাউনের সম্প্রদায়ের ডুবে মরার পর বনি ইসরাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কিনা? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে; যেমন আয়াত اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ-এর দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায়; তবে মিসরে তাদের আধিপত্য আলোচ্য তূর পর্বতে তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে তাতে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তওরাতের পাতা বা তখতী হযরত মূসা (আ)-কে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সে তখতীগুলোর নামই হলো 'তওরাত'।

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَ
اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ
سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ
الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ
اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا
ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِىْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا
لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا

رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ
مِنْۢ بَعْدِىْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ
اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ۭ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا
يَقْتُلُوْنَنِىْ ۠ فَلَا تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَاۗءَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ ۠
وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

(১৪৬) আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হিদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শন-সমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বে-খবর রয়ে গেছে। (১৪৭) বস্তুত যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন সে বদলাই পাবে যেমন আমল করত। (১৪৮) আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর যা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ। তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না ? তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তুত তারা ছিল জালিম। (১৪৯) অতপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ্ হয়ে পড়েছি, তখন বলতে লাগল আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ার-দিগার করুণা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। (১৫০) তারপর যখন মূসা (আ) নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ। তোমরা নিজ পরওয়ারদিগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে! এবং সে তখতীগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন! ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গণ্য করো না। (১৫১) মূসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার, ক্ষমা কর আমাকে আর

আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যে সর্বাধিক করুণাময়।

তফসীরের-সার সংক্ষেপ

(আনুগত্যের উৎসাহ দানের পর এবার বিরোধিতার দরুন ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে,) আমি এমন সব লোককে আমার নির্দশনাবলী থেকে বিমুখ করে রাখব যারা পৃথিবীতে (নির্দেশ ও বিধানাবলী মান্য করার ব্যাপারে) দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে, যার কোন অধিকারই তাদের নেই। (কারণ, নিজেকে বড় মনে করা, তারই অধিকারভুক্ত বিষয়, যিনি প্রকৃতপক্ষেই বড়। আর তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্।) আর (তাদের জন্য এই বিমুখতার ফল দাঁড়াবে এই যে,) যদি সমগ্র (বিশ্বের) নিদর্শন-সমূহ (-ও তারা) দেখে নেয়, তবুও (চরম রূঢ়তাবশত) সেগুলোর প্রতি ঈমান আনবে না এবং হিদায়েতের পথ দেখেও তাকে নিজেদের চলার পথ হিসাবে গ্রহণ করবে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে নিজ পথ হিসাবে গ্রহণ করে নেবে। (অর্থাৎ সত্যকে গ্রহণ না করাতে অন্তর কঠিন ও রূঢ় হয়ে পড়ে এবং বিমুখতা এমনি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে।) আর (এপর্যায়ের বিমুখতা) এ কারণে যে, তারা আমার আয়াত (বা নির্দশন)-সমূহকে (আত্মম্ভরিতার দরুন) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং (তার তাৎপর্য অনুধাবনে) নিরুৎসাহী রয়েছে। (হিদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকার এ শাস্তি তো হলো দুনিয়াতে---) আর (আখিরাতের শাস্তি হবে এই যে,) এসব লোক, যারা আমার আয়াতসমূহকে এবং কিয়ামতের আগমনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে, তাদের সমস্ত কর্ম (যার মাধ্যম দ্বারা তাদের লাভের আশা ছিল) ব্যর্থ হয়ে যাবে। (আর এই ব্যর্থতার পরিণতিই হল জাহান্নাম।) এদেরকে সে শাস্তিই দেওয়া হবে, যা কিছু এরা করত। আর [মূসা (আ) তওরাত আনার জন্য তূর পর্বতে চলে গেলে] মূসা (আ)-র সম্প্রদায় (অর্থাৎ বনি ইসরাঈল তাঁর যাওয়ার পর নিজেদের অধিকৃত) অলঙ্কারাদির দ্বারা (যা তারা কিবতীদের কাছ থেকে মিসর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বিয়ের ভান করে চেয়ে এনেছিল) একটি বাছুর (বানিয়ে তাকে) উপাস্য সাব্যস্ত করল। (যার তাৎপর্য ছিল এতটুকুই যে,) একটা কাঠামো ছিল যার মধ্যে ছিল একটা শব্দ। (এছাড়া তাতে আর কোন মহত্বই ছিল না, যাতে কোন বুদ্ধিমানের মনে উপাস্য বলে ভ্রম হতে পারে।) তারা কি দেখেনি যে, (তাতে একটা মানুষের সমান ক্ষমতাও ছিল না? এবং) সেটা তাদের সাথে কোন কথাও বলতে পারছিল না, কিংবা তাদেরকে (দীন বা দুনিয়ার) কোন পথও বাতলে দিচ্ছিল না----(আল্লাহ্র মত কোন বৈশিষ্ট্য তো দূরের কথা। যাহোক,) এ বাছুরটিকে তারা উপাস্য সাব্যস্ত করল এবং (যেহেতু এতে প্রকৃত কোন সন্দেহের কারণ ছিল না, সেহেতু তারা) একটা বোকার মত কাজই করল। আর মূসা (আ)-র ফিরে আসার পর (যার বর্ণনা পরে আসছে---- তাঁর সতর্কীকরণে) যখন (বিষয়টি তারা বুঝতে পারল এবং নিজেদের এহেন গর্হিত-আচরণের দরুন) লজ্জিত হল আর জানতে

পারল যে, বাস্তবিকই তারা পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে, তখন (অনুতাপভরে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং) বলতে লাগল, আমাদের পরওয়ারদিগার যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদের (এ) পাপ ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাব। (সুতরাং এক বিশেষ পন্থায় তওবা করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হল---সে কাহিনী সূরা বাকারার فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ... আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।)

আর [মূসা (আ)-কে সতর্কীকরণের ব্যাপারটি হলো এই যে,] যখন মূসা (আ) স্বীয় জাতির নিকট (তূর থেকে) ফিরে এলেন (একান্ত) রুষ্ট ও অনুতপ্ত অবস্থায়, (কারণ, ওহীর মাধ্যমে তিনি বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন। যা সূরা 'তোয়াহা'তে রয়েছে ঃ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا .....) তখন (প্রথমে সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে) বললেন, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে এ কাজটি একান্ত গর্হিত করেছ। তোমরা কি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নির্দেশের (আগমনের) পূর্বেই (এহেন) তাড়া-হুড়া করে ফেললে? (আমি যে নির্দেশ নিয়ে আসার জন্যই গিয়েছিলাম---তার অপেক্ষা করলেও তো পারতে।) আর [অতপর তিনি হযরত হারূন (আ)-এর প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং ধর্মীয় জোশের আতিশয্যে] সহসা (তওরাতের) তখতী-গুলো একদিকে সরিয়ে রাখলেন (তা এত জোরে রাখলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যেন ছুঁড়ে মেরেছেন) এবং (হাত খালি করে নিয়ে) স্বীয় ভ্রাতা [হারূন (আ)]-এর মাথা (অর্থাৎ মাথার চুল) ধরে তাঁকে নিজের দিকে (এই বলে) টানতে লাগলেন যে, কেন তুমি যথাযথ ব্যবস্থা নিলে না? (আর যেহেতু রাগের বশে অনেকটা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এবং সে রাগও ছিল একান্ত ধর্মীয় কারণে, সেহেতু এ রাগকে যথার্থ বলেই সাব্যস্ত করা যায় এবং তাঁর এই ইজতিহাদজনিত বিচ্যুতির জন্য কোন প্রশ্ন তোলা যায় না।) হারূন (আ) বললেন, হে আমার মায়ের পক্ষীয় ভাই, (আমি আমার সাধ্যানুযায়ী) তাদেরকে (বাধা দিয়েছি, কিন্তু) তারা আমাকে গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং (বরং উপদেশদানের কারণে) আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। এমতাবস্থায় আমার সাথে রূঢ় ব্যবহার করে তুমি শত্রুকে হাসাবার ব্যবস্থা করো না। আর (তোমার ব্যবহার দ্বারা) আমাকে অত্যাচারী জালিমদের সারিতে গণ্য করো না (যে, তাদেরই মত অসন্তোষ আমার প্রতিও প্রকাশ করতে থাকবে)। মূসা (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলেন (এবং) বললেন, ইয়া পরওয়ারদিগার, আমার ত্রুটি (যদিও তা ইজতিহাদজনিত) ক্ষমা করে দাও। আর আমার ভাই হারূন (আ)-এর ত্রুটিও (ক্ষমা করে দাও, যা সেই মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে।) হয়তো ঘটেছে। (যেমন ঃ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَنْ لَا تَتَّبِعَنِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়।) আর আমাদের দু'জনকেই তোমার (বিশেষ) রহমতের (বা করুণার) অন্তর্ভুক্ত

করে নাও। বস্তুত তুমিই সমস্ত করুণা প্রদর্শনকারীদের অপেক্ষা অধিক করুণাময় (সেজন্য আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা মঞ্জুরীর সর্বাধিক আশা করতে পারি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে সেসব লোককে বিমুখ বা বঞ্চিত করব, যারা পৃথিবীতে অধিকার না থাকা সত্ত্বেও গর্বিত, অহংকারী হয়।"

এখানে "অধিকার না থাকা" শব্দটি প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গর্বিত অহংকারীদের মুকাবিলায় প্রতি-অহংকার করা অন্যায় বা গোনাহ্ নয়। কারণ, এক্ষেত্রে তা শুধু বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে অহংকার, প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। যেমন, প্রবাদ আছে التكبر مع المتكبرين تواضع অর্থাৎ অহংকারীদের সাথে প্রতি অহংকারই হলো নম্রতা।—মাসায়েলে-সুলুক

অহংকার মানুষকে সুষ্ঠু জ্ঞান ও ঐশী ইলম থেকে বঞ্চিত করে দেয়ঃ আর গর্বিত-অহংকারীদের স্বীয় নিদর্শনসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়ার প্রকৃত মর্ম হচ্ছে এই যে, তাদের থেকে আল্লাহ্র নিদর্শন বা আয়াতসমূহ বোঝা বা উপলব্ধি করার এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য ও তওফীক তুলে নেয়া হয়। আর এখানে 'আল্লাহ্র নিদর্শন বা আয়াত' কথাটিও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যাতে তওরাত, যবুর ও কোরআনে বর্ণিত আয়াত বা নিদর্শনসমূহ যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনি-ভাবে অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ যা আসমান, যমীন ও তাতে অবস্থিত সৃষ্টির মাঝে বিস্তৃত। কাজেই আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, তাকাব্বুর, অর্থাৎ নিজেকে নিজে অন্যদের চাইতে বড় ও উত্তম মনে করা এমনই দুষণীয় ও জঘন্য অভ্যাস যে, এতে যে পতিত হয়, তার সুষ্ঠু বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে না। সেজন্যই সে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। না থাকে কোরআনের আয়াত বুঝবার ক্ষমতা ও তওফীক, না আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যথার্থ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্র মা'রেফাত বা পরিচয় লাভ।

তফসীরে রূহুল-বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে একথাই বোঝা যায় যে, অহংকার ও গর্ব এমন এক মন্দ অভ্যাস, যা ঐশী জ্ঞান লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, আল্লাহ্র জ্ঞান লাভ হতে পারে একমাত্র আল্লাহ্রই রহমতে। আর আল্লাহ্র রহমত হয় একমাত্র বিনম্রতার মাধ্যমে। কাজেই হযরত মাওলানা রূমী যথার্থই বলেছেন ঃ

هر كجا پستى ست آب آنجا رود
هر كجا مشكل جواب آنجا رود

("যেদিকে ঢালু পানি সেদিকেই গড়ায়, যেখানে জটিলতা উত্তরও সেদিকেই যায়।)"

প্রথম দুই আয়াতে এ বিষয়টি আলোচনা করার পর পুনরায় হযরত মূসা (আ) ও বনি ইসরাঈলদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়ঃ

হযরত মূসা (আ) যখন তওরাত গ্রহণ করার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়ে ধ্যানে বসলেন এবং ইতিপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ধ্যানের যে নির্দেশ হয়েছিল, সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব; সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা যখন আরও দশ দিন ধ্যানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইসরাঈলী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। তাঁর সম্প্রদায়ে 'সামেরী' নামে একটি লোক ছিল। তাকে সম্প্রদায়ের লোকেরা 'বড় মোড়ল' বলে মানত। কিন্তু সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনি ইসরাঈলের লোকদের বলল, তোমাদের কাছে ফিরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব অলংকারপত্র রয়েছে, সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলঙ্কারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে; কাজেই এগুলো তোমাদের জন্য হালাল নয়। কারণ, তখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে বিজিত সম্পদও হালাল ছিল না। বনি ইসরাঈলরা তার কথামত সমস্ত অলংকার তার কাছে (সামেরীর কাছে) এনে জমা দিল। সে এই সোনা-রূপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরি করল এবং হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল এবং যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জীবন ও জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সোনারূপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে মাটি তাতে মিশিয়ে দিল। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হলো এবং তার ভেতর থেকে গাভীর মত হাম্বা রব বেরোতে লাগল। এক্ষেত্রে عجلا শব্দের ব্যাখ্যায় جسدا له خوار বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামেরীর এ বিস্ময়কর পৈশাচিক আবিষ্কার যখন সামনে উপস্থিত হলো, তখন সে বনি ইসরাঈলদের কুফরীর প্রতি আমন্ত্রণ জানাল যে, "এটাই হলো খোদা। মূসা (আ) তো আল্লাহ্র সাথে কথা বলার জন্য গেছেন তূর পাহাড়ে, আর এদিকে আল্লাহ্ (নাউযুবিল্লাহ্) সশরীরে এখানে এসে হাযির হয়ে গেছেন। মূসা (আ)-র সত্যি ভুলই হয়ে গেল।" বনি ইসরাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন তার এই অদ্ভুত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই; সবাই একেবারে ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং গাভীকে আল্লাহ্ মনে করে তারই উপাসনা-ইবাদতে প্রবৃত্ত হল।

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে এ বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। কোরআন মজীদের অন্যত্র বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে মূসা (আ)-র সতর্কীকরণের পর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে বনি ইসরাঈলদের তওবার কথা বলা হয়েছে। এতে আরবী প্রবাদ অনুযায়ী سُقِطَ فِي

أَلْدِيْهِمْ অর্থ হচ্ছে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।

পঞ্চম আয়াতে এ ঘটনারই বিস্তারিত বর্ণনা যে, হযরত মূসা (আ) যখন কুহে-তূর থেকে তওরাত নিয়ে ফিরে এলেন এবং নিজের সম্প্রদায়কে বাছুরের পূজায় লিপ্ত দেখতে পেলেন, তখন তাঁর রাগের সীমা রইল না। আল্লাহ্ তা'আলা যদিও ইসরাঈলী-দের এ গোমরাহীর কথা কুহে-তূরেই ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শোনা এবং দেখার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। কাজেই তাদের এহেন গোমরাহী এবং বাছুরের পূজাপাঠ সচক্ষে দেখার পর অধিকতর রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

তিনি প্রথমে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي অর্থাৎ তোমরা আমার অবর্তমানে এটা একান্তই মূর্খজনোচিত কাজ করেছ। أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি তোমাদের পরওয়ারদিগারের নির্দেশ আনার চেয়েও তাড়াহুড়া করলে? অর্থাৎ অন্তত আল্লাহ্র কিতাব তওরাতের আসা পর্যন্তই নাহয় অপেক্ষা করতে—তোমরা তার চেয়েও তাড়াহুড়া করে এহেন গোমরাহী অবলম্বন করে নিলে? এ ক্ষেত্রে কোন কোন মুফাসসির এ বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন যে, তোমরা তাড়াহুড়া করে কি এটাই সাব্যস্ত করে নিলে যে, আমার মৃত্যু ঘটে গেছে?

অতপর হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-এর প্রতি এগিয়ে গেলেন যে, তাঁকে যখন নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এই গোমরাহীর সময় কেন বাধা দিলেন না? তাঁকে ধরার জন্য হাত খালি করার প্রয়োজন হলে তওরাতের তখতীগুলো যা হাতে করে নিয়েই এসেছিলেন, তাড়াতাড়ি রেখে দিলেন। কোরআন মজীদ এ কথাটিই এভাবে ব্যক্ত করেছে যে : أَلْقَى الْأَلْوَاحَ । إِلْقَاءٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ ফেলে দেওয়া। আর أَلْوَاحٌ হল لَوْحٌ--এর বহুবচন। যার অর্থ হলো তখতী। এখানে إِلْقَاءٌ শব্দে সন্দেহ হতে পারে যে, হযরত মূসা (আ) হয়তো রাগের বশে তওরাতের তখতীসমূহের অমর্যাদা করে ফেলে দিয়ে থাকবেন।

কিন্তু একথা সবারই জানা যে, তওরাতের তখতীসমূহকে অমর্যাদা করে ফেলে দেওয়া মহাপাপ। পক্ষান্তরে সমস্ত নবী-রসূল (আ) যাবতীয় পাপ থেকে পবিত্র ও

মা'সূম। কাজেই এক্ষেত্রে আয়াতের মর্ম হল এই যে, আসল উদ্দেশ্য ছিল হযরত হারূন (আ)-কে ধরার জন্য হাত খালি করা। আর রাগান্বিত অবস্থায় তাড়াতাড়িতে সেগুলোকে যেভাবে রাখলেন, তা দেখে আপাত দৃষ্টিতে মনে হলো যেন সেগুলোকে বুঝি ফেলেই দিয়েছেন। কোরআন মজীদ একেই সতর্কতার উদ্দেশ্যে ফেলে দেওয়া শব্দে উল্লেখ করেছে।— বয়ানুল কোরআন

তারপর এই ধারণাবশত হযরত হারূন (আ)-কে মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন যে, হয়তো তিনি প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে থাকবেন। তখন হযরত হারূন (আ) বললেন, ভাই এক্ষেত্রে আমার কোন দোষ নেই। সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কথার কোনই গুরুত্ব দেয়নি। আমার কথা তারা শোনেনি। বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। কাজেই আমার সাথে এমন ব্যবহার করবেন না, যাতে আমার শত্রুরা খুশি হতে পারে। আর আমাকে এই পথভ্রষ্টদের সাথে রয়েছি বলেও ভাববেন না। তখন মূসা (আ)-র রাগ পড়ে গেল এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন, رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার ভাইকেও ক্ষমা করে দিন। আর আমাদের আপনার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি যে সমস্ত করুণাকারীর মধ্যে সবচেয়ে মহান করুণাময়।

এখানে স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আ)-এর প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা হয়তো এই জন্য করলেন যে, হয়তো বা সম্প্রদায়কে তাদের গোমরাহী থেকে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে কোন রকম ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। আর নিজের জন্য হয়তো এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাড়াহুড়ার মধ্যে তওরাতের তখতীগুলোকে এমনভাবে রেখে দেওয়া, যাকে কোরআন মজীদ 'ফেলে দেওয়া' শব্দে উল্লেখ করে তা ভুল হয়েছে বলে সতর্ক করেছে— তারই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। অথবা এটা প্রার্থনারই একটা রীতি যে, অন্যের জন্য দোয়া প্রার্থনা করার সময় নিজেকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় যাতে এমন বোঝা না যায় যে, নিজকে দোয়ার মুখাপেক্ষী মনে করা হয়নি।

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ
ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٣﴾

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖ وَفِيْ نُسْخَتِهَا
هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَاخْتَارَ مُوْسٰى
قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّاۤ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ
رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۭ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۭ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَ
تَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ۭ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ
الْغٰفِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ
اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۭ قَالَ عَذَابِيْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَ
رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۭ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٦﴾

(১৫২) অবশ্য যারা গো-বৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর তাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গযব ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এভাবে আমি অপবাদ আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপর তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদিগার তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, করুণাময়। (১৫৪) তারপর যখন মূসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখতীগুলো তুলে নিলেন। আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সেই সমস্ত লোকের জন্য হিদায়েত ও রহমত যারা নিজেদের পরওয়ারদিগারকে ভয় করে। (১৫৫) আর মূসা বেছে নিলেন নিজের সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য। তারপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার, তুমি যদি ইচ্ছা করতে তবে তাদেরকে আগেই ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও। আমাদেরকে কি সে কর্মের কারণে ধ্বংস করছ, যা আমার সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা করেছে? এ সবই তোমার পরীক্ষা; তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে রাখবে। তুমিই তো আমাদের রক্ষক---সুতরাং আমাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর

করুণা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী। (১৫৬) আর পৃথিবীতে এবং আখিরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার আযাব তারই উপর চাপিয়ে দিই যার উপর ইচ্ছা করি। বস্তুত আমার রহমত সবকিছুর উপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[অতপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই বাছুরের উপাসনাকারীদের সম্পর্কে হযরত মূসা (আ)-কে বললেন,] যারা বাছুরের পূজা করেছে (তারা যদি এখনও তওবা না করে, তাহলে) শীঘ্রই তাদের উপর তাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গযব ও অপমান এসে পড়বে। আর (শুধু তাদের বেলায়ই নয়, বরং) আমি (তো) মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি (---তারা পার্থিব জীবনেই গজবে পতিত হয়ে লাঞ্ছিত-পদদলিত হয়ে যায়। তবে কোন কারণে সে গযবের প্রকাশ তাৎক্ষণিক না হয়ে দেরিতেও হতে পারে। সুতরাং তওবা না করার দরুন সামেরীর প্রতি সে গযব ও অপমান প্রকাশিত হয়েছিল, যা সূরা 'তোয়াহাতে বর্ণিত হয়েছে ঃ-(قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ

আর যারা পাপের কাজ করেছে (যেমন, তাদের বাছুর পূজার মত গর্হিত কাজ হয়ে গেছে, কিন্তু) পরে তারা (অর্থাৎ সে পাপের কাজ করে ফেলার পর) তওবা করে নিয়েছে এবং (সে কুফরী পরিহার করে) ঈমান এনেছে; তোমাদের পরওয়ারদিগার এ তওবার পরে (তাদের) গোনাহ্ ক্ষমাকারী, (এবং তাদের অবস্থার প্রতি) দয়া প্রদর্শনকারী। (অবশ্য তওবার সম্পূর্ণতার জন্য اُقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ-এর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কারণ, প্রকৃত রহমত বা দয়া হলো আখিরাতের দয়া। কাজেই যারা তওবা করেছে তাদের পাপ সেভাবেই খণ্ডিত হয়েছে।) আর [হারূন (আ)-এর এই ওযর-আপত্তি শুনে] যখন মূসা (আ)-র রাগ পড়ে গেল, তখন সেই তখ্তীগুলো তুলে নিলেন। বস্তুত সেগুলোর বিষয়বস্তুতে সেসব লোকের জন্য হিদায়েত ও রহমত ছিল, যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করত (অর্থাৎ সে তখ্তীগুলোতে বর্ণিত নির্দেশাবলী যার অনুশীলন হিদায়ত ও রহমতের কারণ হতে পারে)। আর [বাছুরের ইতিবৃত্ত যখন সমাপ্ত হয়ে গেল, তখন হযরত মূসা (আ) নিশ্চিন্তে তওরাতের নির্দেশাবলী প্রচার করতে লাগলেন। যেহেতু তাদের স্বভাবই ছিল সন্দেহ-প্রবণ, কাজেই তারা তাতেও সন্দেহ-সংশয় খুঁজে বের করল যে, এটা যে আল্লাহ্রই নির্দেশ আমরা তা কেমন করে বুঝব? আমাদের সাথে যদি আল্লাহ্ নিজে বলে দেন তাহলেই বিশ্বাস করা যায়। তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিষয়টি নিবেদন

করলেন। সেখান থেকে হুকুম হলো যে, যাদেরকে তারা বিশ্বস্ত বলে মনে করে, এমন কিছু লোককে বাছাই করে তূরে নিয়ে এসো—আমি নিজেই তাদেরকে বলে দেব যে, এগুলো আমারই নির্দেশ। তখন তাদের নিয়ে আসার জন্য একটা সময় ধার্য করা হল। সুতরাং] মূসা (আ) আমার নির্ধারিত সময়ে (তূরে নিয়ে আসার জন্য) সম্প্রদায়ের সত্তর জন লোককে নির্বাচিত করলেন। (সেখানে পেঁৗছে যখন তারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনল, তখন তাদের মধ্য থেকে একদল বেরিয়ে গিয়ে বলল, আল্লাহ্‌ই জানে কে কথা বলছে! আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, যখন আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে নিজের চোখে দেখতে পাব। আল্লাহ্‌র ভাষায় لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً আল্লাহ্ তা'আলা এই ধৃষ্টতার শাস্তি দিলেন। নিচের দিক থেকে এল ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে শুরু হল এমন ভয়াবহ বজ্র গর্জন যে, কেউ আর ফিরতে পারল না; সবাই সেখানেই স্তব্ধ হয়ে রয়ে গেল। সুতরাং) যখন তাদেরকে ভূমিকম্প (প্রভৃতি) এসে আঁকড়ে ধরল, [তখন মূসা (আ) মনে মনে ভয় করলেন যে, এমনিতেই বনি ইসরাঈল মূর্খ ও সন্দেহ-সংশয়গ্রস্ত তারা মনে করবে, হয়তো মূসাই কোথাও নিয়ে গিয়ে এভাবে কোন রকমে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। তখন সভয়ে] তিনি নিবেদন করলেন, হে পরওয়ারদিগার, (আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, তাদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ-ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ,) এই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইতিপূর্বেই আপনি তাদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস করে দিতেন। (কারণ, এ মুহূর্তে তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অর্থ বনি ইসরাঈলদের হাতে আমারও ধ্বংস হয়ে যাওয়া। আপনার যদি এমনি উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে আগেও এমনটি করতে পারতেন, কিন্তু তা যখন করেন নি, তখন বুঝতে পেরেছি যে, তাদেরকে ধ্বংস করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এতে আমার দারুণ বদনাম হবে এবং আমিও ধ্বংস হয়ে যাব। অতএব আমার বিশ্বাস ও আশা, আপনি আমাকে বদনামের ভাগী করবেন না। তাছাড়া) আপনি কি আমাদের কয়েকজন আহাম্মকের গহিত আচরণের দরুন সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন! (ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বোকামী করবে এরা; আর তাতে বনি ইসরাঈলদের হাতে আমিও ধ্বংস হব। আমার একান্ত বিশ্বাস, আপনি তা করবেন না। সুতরাং বোঝা গেল যে, ভূমিকম্প ও বজ্র গর্জনের এ ঘটনাটি আপনার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা মাত্র।) এমন পরীক্ষার দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা গোমরাহীতে ফেলতে পারেন। (অর্থাৎ কেউ হয়তো এতে আল্লাহ্‌র প্রতি অভিযোগ এবং তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু করতে পারে।) আবার আপনার যাকে ইচ্ছা তার রহস্য ও কল্যাণসমূহ (অনুধাবনের মাধ্যমে) হিদায়েতে অবিচল রাখতে পারেন। (কাজেই আমি আপনার অনুগ্রহ ও দয়ায় আপনি যে মহাজ্ঞানী রহস্যজ্ঞাত সে বিষয়ে জানি। সেজন্য এ পরীক্ষায় আমি নিশ্চিন্ত। তাছাড়া) আপনিই তো আমাদের অভি-ভাবক; আমাদের ক্ষমা করে দিন, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করুন। আর আপনি সমস্ত ক্ষমাকারীদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমাশীল। [সুতরাং তাদের পাপ ক্ষমা

করে দিন। (এ প্রার্থনার পর) সবাই যথাপূর্ব জীবিত হয়ে ওঠে। সূরা বাকারায় এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।] আর (এ দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রহমত বা দয়ার বিশ্লেষণ হিসেবে এ দোয়াও করলেন যে, হে পরওয়ারদিগার,) আমাদের জন্য পার্থিব জীবনেও কল্যাণকর সচ্ছলতা লিখে দিন এবং (তেমনিভাবে) আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। (কেননা) আপনার প্রতি (আমরা একান্ত নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সাথে) ফিরে এসেছি। আল্লাহ্ তা'আলা [মূসা (আ)-র দোয়া কবুল করে নিয়ে] বললেন, (হে মূসা, একে তো আমার রহমত আমার গযবের চেয়ে অগ্রবর্তী, কাজেই) আমি আমার আযাব (ও গযব) তারই উপর আরোপ করে থাকি, যার উপর ইচ্ছা করি। (যদিও প্রত্যেক না-ফরমান বা কৃতঘ্নই এর যোগ্য, কিন্তু তবুও সবার উপর তা আরোপ করি না; বরং বিশেষ বিশেষ লোকদের উপরই তা আরোপ করে থাকি, যারা সীমাহীনভাবে উদ্ধত ও কৃতঘ্ন হয়ে থাকে।) আর আমার রহমত (এমনই ব্যাপক যে,) তা যাবতীয় বিষয়কে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। (অথচ অনেক সৃষ্টি এমনও রয়েছে যারা তার অধিকারী হয় না। যেমন, উদ্ধত ও বিদ্বেষপরায়ণ লোক। কিন্তু তাদের প্রতিও এক রকম রহমত রয়েছে, তা সে রহমত যদিও পার্থিব মাত্র। সুতরাং আমার রহমত যখন তা পাবার অযোগ্যদের জন্যও ব্যাপক,) তখন সে রহমত তাদের জন্য তো (পরিপূর্ণভাবে) লিখবই যারা (প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী, এর অধিকারী---) আল্লাহ্কে ভয় করে (যা মনের সাথে সম্পৃক্ত আমল), যাকাত দান করে (যা সম্পদের সাথে জড়িত কাজ) এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান স্থাপন করে (যা হলো বিশ্বাস সংক্রান্ত ব্যাপার। এসব লোক তো প্রথম পর্যায়েই রহমত পাবার যোগ্য। আপনি অনুরোধ না করলেও তারা তা পেত। তদুপরি এখন যখন আপনিও তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন যে, وَاكْتُبْ لَنَا وَارْحَمْنَا তখন আমি তা গ্রহণ করার সুসংবাদ দিচ্ছি। কারণ, আপনি নিজে তো তেমন রয়েছেনই; আর আপনার জাতির মধ্যে যারা রহমতের অধিকারী হতে চাইবে, তাদেরকে এমনি গুণাবলীতে সুসজ্জিত হতে হবে যাতে তা লাভ করতে পারে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এটা সূরা আ'রাফের ১৯তম রুকূ। এ রুকূর প্রথম আয়াতে গোবৎসের উপাসনাকারী এবং তারই উপর যারা স্থির ছিল সেসব বনী ইসরাঈলের অশুভ পরিণতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আখিরাতে তাদেরকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের গযবের সম্মুখীন হতে হবে, যার পরে আর পরিত্রাণের কোন জায়গা নেই। তদুপরি পার্থিব জীবনে তাদের ভাগ্যে জুটবে অপমান ও লাঞ্ছনা।

কোন কোন পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায়ঃ সামেরী ও তার সঙ্গীদের যেমন হয়েছিল যে, গোবৎস উপাসনা থেকে যখন তারা যথার্থভাবে তওবা

করল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ পৃথিবীতে অপদস্থ-অপমানিত করে ছেড়েছেন। তাকে মূসা (আ) নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে; সেও যাতে কাউকে না ছোঁয়, তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারা জীবন এমনিভাবে জীব-জন্তুর সাথে বসবাস করতে থাকে; কোন মানুষ তার সংস্পর্শে আসতো না।

তফসীরে-কুরতুবীতে হযরত কাতাদাহ্ (রা)-র উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর এমন আযাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত।----(কুরতুবী)

তফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, আজও তার বংশধরদের মাঝে এমনি অবস্থা বিদ্যমান। আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে ঃ- وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি। হযরত সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ্ (র) বলেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে বিদ'আত অবলম্বন করে (অর্থাৎ ধর্মে কোন রকম কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে,) তারাও আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তিরই যোগ্য হয়ে পড়ে।----(মাযহারী)

ইমাম মালিক (র) এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেছেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বিদ'আত বা কুসংস্কার আবিষ্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখিরাতে আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হবে এবং পার্থিব জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে।----(কুরতুবী)

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ)-র সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তওবা করে নিয়েছে এবং তওবার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে কঠোরতর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তওবা কবুল হবে---তারা সে শর্তও পালন করল, তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের সবার তওবাই কবুল হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে, আর যারা বেঁচে রয়েছে তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফরীও যদি হয়, তবুও পরবর্তীতে তওবা করে নিলে এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবি অনুযায়ী নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ্ তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোন পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তওবা করে নেওয়া একান্ত কর্তব্য।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ)-র রাগ যখন প্রশমিত হয়, তখন তাড়াতাড়িতে ফেলে রাখা তওরাতের তখতীগুলো আবার উঠিয়ে নিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলাকে যারা ভয় করে তাদের জন্য সে 'সংকলন'-এ হিদায়ত ও রহমত ছিল।

نسخة বা 'সংকলন' বলা হয় সে লেখাকে যা কোন গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) রাগের মাথায় যখন তওরাতের তখতীগুলো তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙে গিয়েছিল। ফলে পরে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন কিছুতে লেখা তওরাত দান করেছিলেন। তাকেই 'নোসখা' বা সংকলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্তর জন বনী-ইসরাঈলের নির্বাচন এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা ঃ চতুর্থ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্র কিতাব তওরাত নিয়ে এসে বনী ইসরাঈলদের দিলেন, তখন নিজেদের বক্রতা ও ছলছুঁতার দরুন বলতে লাগল যে, আমরা একথা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এটা আল্লাহ্রই কালাম? এমনও তো হতে পারে যে, আপনি নিজেই এগুলো নিয়ে এসে থাকবেন। মূসা (আ) তখন এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আপনি এ সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যক্তিদের তূরে নিয়ে আসুন। আমি তাদেরকেও নিজের কালাম শুনিয়ে দেব। তাহলেই বিষয়টি তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে। মূসা (আ) তাদের মধ্য থেকে সত্তর জনকে নির্বাচিত করে তূরে নিয়ে গেলেন। ওয়াদা অনুযায়ী তারা নিজ কানে আল্লাহ্র কালামও শুনল। এ প্রমাণও যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তখন তারা পুনরায় বলতে লাগল, কে জানে, এ শব্দ আল্লাহ্রই, না অন্য কারও! আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, আল্লাহ্কে যখন প্রকাশ্যে আমাদের সামনে সরাসরি দেখতে পাব। তাদের এ দাবি যেহেতু একান্তই হঠকারিতা ও মূর্খতার ভিত্তিতে ছিল, তাই তাদের উপর ঐশী রোষানল বর্ষিত হল। ফলে তাদের নিচের দিক থেকে এল ভূকম্পন, আর উপর দিক থেকে শুরু হল বজ্র গর্জন। যার দরুন তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এবং দৃশ্যত মৃতে পরিণত হল। এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাকারায় এক্ষেত্রে صاعقة (সায়ে'কাহ্) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে رجفة (রাজফাহ্)। 'সায়েকা' অর্থ বজ্র গর্জন। আর 'রাজফাহ্' অর্থ ভূকম্পন। কাজেই ভূকম্পন ও বজ্র গর্জন একই সাথে আরম্ভ হয়ে যাওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়।

যাহোক, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হোক আর নাই হোক, তারা মৃতের মত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, যাতে বাহ্যত মৃত বলেই মনে হতে পারে। এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। কারণ, একে তো এরা ছিল সম্প্রদায়ের বাছা বাছা (বুদ্ধি-জীবী) লোক, দ্বিতীয়ত জাতির কাছে গিয়ে তিনি কি জবাব দেবেন। তারা অপবাদ আরোপ করবে যে, মূসা (আ) তাদেরকে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছে। তদুপরি এ অপবাদ আরোপের পর এরা আমাকেও রেহাই দেবে না; নির্ঘাৎ হত্যা করবে। সেজন্যই তিনি আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করলেন; ইয়া পরওয়ারদিগার, আমি

জানি, এ ঘটনায় তাদেরকে হত্যা করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তাই যদি হতো, তবে ইতিপূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে এরা নিহত হয়ে যেতে পারত; ফিরাউনের সাথে তাদের সলিল সমাধিও হতে পারত; কিংবা গোবৎস পূজার সময়ও সবার সামনে হত্যা করে দেওয়া যেতে পারত। তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে আমাকেও তাদের সাথেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তা চাননি। তাতে বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো শাস্তি দেওয়া এবং সতর্ক করা। তাছাড়া এটা হয়ই-বা কেমন করে যে, আপনি আমাদের কয়েকজন নিরেট মূর্খের কার্যকলাপের দরুন আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন! এ ক্ষেত্রে 'নিজেকে নিজে ধ্বংস করা' এ জন্য বলা হয়েছে যে, এই সত্তর জনের এভাবে অদৃশ্য মৃত্যুর পরিণতি সম্প্রদায়ের হাতে মূসা (আ)-র ধ্বংসেরই নামান্তর ছিল।

অতপর নিবেদন এই যে, আমি জানি, এটা একান্তই আপনার পরীক্ষা, যাতে আপনি কোন কোন লোককে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ করে দেন, যার ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার না-শোকর বা কৃতঘ্ন হয়ে ওঠে। আবার অনেককে এর দ্বারা সুপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার তত্ত্ব ও কল্যাণসমূহকে উপলব্ধি করে প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। আমিও আপনার বিজ্ঞতা ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত রয়েছি। সুতরাং আপনার এ পরীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট! তাছাড়া আপনিই তো আমাদের প্রকৃত অভিভাবক----আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি করুণা ও রহমত দান করুন। আপনিই সমস্ত ক্ষমাকারীদের মধ্যে মহান ক্ষমাকারী। কাজেই তাদের ধৃষ্টতাকেও ক্ষমা করুন। বস্তুত (এ প্রার্থনার পর) তারা যথাপূর্ব জীবিত হয়ে ওঠে।

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এই সত্তর জন লোক, যাদের আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে এরা أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً (আল্লাহ্কে আমরা প্রকাশ্যে দেখতে চাই)-এর নিবেদনকারী ছিল না, যারা বজ্র গর্জনের দরুন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এরা ছিল সেইসব লোক, যারা গো-বৎসের উপাসনায় নিজেরা অংশগ্রহণ না করলেও জাতি বা সম্প্রদায়কে তা থেকে বিরত রাখারও চেষ্টা করেনি। এরই শাস্তি হিসাবে তাদের উপর নেমে এসেছে বজ্র গর্জন---যার দরুন তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। যাহোক, এরা সবাই মূসা (আ)-র প্রার্থনায় পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে।

পঞ্চম আয়াতে হযরত মূসা (আ)-র সে দোয়ার উপসংহারে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি এই পার্থিব জীবনেও আমাদিগকে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। কারণ, আমরা আপনার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও আনুগত্য সহকারে ফিরে আসছি।

এরই প্রতিউত্তরে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ— عَذَابِىْٓ اُصِيْبُ

بِهٖ مَنْ اَشَآءُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ - অর্থাৎ হে মূসা (আ)!

একে তো আমার করুণা ও রহমত সাধারণভাবেই আমার গযব বা রোষানলের অগ্রবর্তী, কাজেই আমি আমার আযাব ও গযব শুধুমাত্র তাদের উপরই আরোপিত করে থাকি, যার উপর ইচ্ছা করি, যদিও সব কাফির বা কৃতঘ্নই এর যোগ্য হয়ে থাকে। কিন্তু তথাপি সবাইকে এই আযাবে পতিত করি না, বরং তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ লোকদের উপরই আযাব আরোপ করি, যারা একান্তভাবেই চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে আমার রহমত এমনই ব্যাপক যে, তা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকেই পরিবেষ্টিত, অথচ তাদের মধ্যেও বহু লোক রয়েছে, যারা এর যোগ্য নয়---যেমন, ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্ট-না-ফরমান। কিন্তু তাদের প্রতিও আমার একরকম রহমত রয়েছে, তা যদিও দুনিয়ার জন্য। কাজেই আমার রহমত অযোগ্যদের জন্যও ব্যাপক। তবে এই রহমত পরিপূর্ণভাবে তাদেরই জন্য নিশ্চিতভাবে লিখে দেব, যারা প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যেমন এর যোগ্য তেমনিভাবে আনুগত্যও পোষণ করে; তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে। এরা তো প্রথমাবস্থাতেই রহমতের অধিকারী। কাজেই আপনাকে আপনার দোয়া কবূল হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ দিচ্ছি।

আল্লাহ্ তা'আলার এই প্রতিউত্তরের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরীন মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তার কারণ, এ ক্ষেত্রে পরিষ্কার ভাষায় দোয়া কবূল হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়নি, যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছেঃ— قَدْ اُوْتِيْتَ

سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى অর্থাৎ হে মূসা (আ) আপনার প্রার্থনা পূরণ করে দেয়া হলো।

আর অন্যত্র যেমন বলা হয়েছেঃ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا অর্থাৎ হে মূসা (আ) তোমাদের উভয়ের দোয়াই গৃহীত হয়েছে। এভাবে আলোচ্য ক্ষেত্রেও পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়নি। সে জন্য কোন কোন মনীষী এ আয়াতের এ মর্মই সাব্যস্ত করেছেন যে, হযরত মূসা (আ)-র প্রার্থনা যদিও তার উম্মতের বেলায় গৃহীত হয়নি, কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের জন্য গৃহীত হয়েছে---যার আলোচনা পরবর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আসবে। কিন্তু তফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ সম্ভাবনাকে

অসম্ভব বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে বর্ণিত প্রতিউত্তরের সঠিক বিশ্লেষণ এই যে, হযরত মূসা (আ) যে প্রার্থনা করেছিলেন, তার দুটি অংশ ছিল। একটি হল এই যে, যাদের প্রতি আযাব ও অভিসম্পাত হয়েছিল, তাদের প্রতি ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা হোক। আর দ্বিতীয় দিকটি ছিল এই যে, আমার ও আমার সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ পরিপূর্ণভাবে লিখে দেয়া হোক। প্রথম অংশের প্রতিউত্তর এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশের প্রতিউত্তর দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক পাপের জন্য শাস্তি না দেয়াই আমার রীতি। অবশ্য (চরম ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার দরুন) শুধু তাদেরকেই শাস্তি দিই, যাদেরকে একান্তভাবেই শাস্তি দেয়া আমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন---তাদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে না। তবে রইল রহমতের ব্যাপার! আমার রহমত তো সব কিছুতেই ব্যাপক---তা সে মানুষ হোক বা অমানুষ, মু'মিন হোক বা কাফির, অনুগত হোক বা কৃতঘ্ন। এমনকি পৃথিবীতে যাদেরকে কোন শাস্তি ও কষ্টের সম্মুখীন করা হয়, তারাও সম্পূর্ণভাবে আমার রহমত বর্জিত হয় না। অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই যে, যেটুকু বিপদে তাকে ফেলা হলো, তার চেয়েও বড় বিপদে ফেলা হয়নি, অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সে ক্ষমতাও ছিল।

মহামান্য ওস্তাদ আন্ওয়ার শাহ্ (র) বলেছেন যে, রহমতের ব্যাপকতর অর্থ হল যে, রহমতের পরিধি কারো জন্যেই সংকুচিত নয়। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতিই রহমত হবে---যেমন ইবলীসে-মালাউন বলেছে যে, আমিও তো একটা বস্তু, আর প্রত্যেকটি বস্তুই যখন রহমতযোগ্য, কাজেই আমিও রহমতের যোগ্য। বস্তুত কোরআন মজীদের শব্দেই ইঙ্গিত রয়েছে, তা বলা হয়নি যে, প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিই রহমত করা হবে। বরং বলা হয়েছে, রহমত বা করুণা সংক্রান্ত আল্লাহ্র গুণ সংকুচিত নয়; অতি প্রশস্ত ও ব্যাপক। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করতে পারেন। কোরআন মজীদের অন্যত্র এর সাক্ষ্য এভাবে দেয়া হয়েছেঃ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ অর্থাৎ এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিন যে, তোমাদের প্রতিপালক ব্যাপক রহমতের অধিকারী, কিন্তু যারা অপরাধী তাদের উপর থেকে তার আযাবকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। এখানে বাত্লে দেয়া হয়েছে যে, রহমতের ব্যাপকতা অপরাধীদের আযাব বা শাস্তির পরিপন্থী নয়।

সারকথা, মূসা (আ)-র প্রার্থনা সেসব লোকের পক্ষে কোন রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই কবুল করে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে ক্ষমাও করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি রহমতও করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় যে প্রার্থনায় দুনিয়া ও আখিরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ লিখে দেয়ার আবেদন করা হয়েছিল, তা কবূল করার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হলো। অর্থাৎ দুনিয়াতে তো মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সবার প্রতিই ব্যাপকভাবে রহমত হতে পারে, কিন্তু আখিরাত হলো ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ের স্থান। সেখানে রহমত লাভের অধিকারী শুধুমাত্র তারাই হতে পারবে, যারা কয়েকটি শর্ত পূরণ করবে। আর তা হল প্রথমত, তাদেরকে তাকওয়া ও পরহিযগারী অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত যাবতীয় কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করবে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে নিজেদের ধন-সম্পদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যাকাত বের করতে হবে। তৃতীয়ত, আমার সমস্ত আয়াত ও নির্দেশসমূহের প্রতি কোন রকম ব্যতিক্রম বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। বর্তমান আলোচ্য লোকগুলোও যদি এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করে নেয়, তাহলে তাদের জন্যও দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ লিখে দেয়া হবে।

কিন্তু এর পরবর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরিপূর্ণভাবে এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তারাই, যারা এদের পরবর্তী যুগে আসবে ও উম্মীনবীর অনুসরণ করবে এবং তার ফলে তারা পরিপূর্ণ কল্যাণের অধিকারী হবে।

হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেছেন, যখন رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন ইবলীস বলল, আমিও এ রহমতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পরবর্তী বাক্যেই বাতলে দেয়া হয়েছে যে, পরকালীন রহমত ঈমান প্রভৃতি শর্তসাপেক্ষ। এ কথা শুনে ইবলীস নিরাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু ইহুদী ও নাসারারা দাবি করল যে, আমাদের মধ্যে তো এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। অর্থাৎ পরহিযগারী, যাকাত দান এবং ঈমান। কিন্তু এর পরেই যখন নবীয়ে উম্মী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা হলো, তখন তাতে সে সমস্ত ইহুদী খৃস্টান পৃথক হয়ে গেল, যারা মহানবী (সা)-র প্রতি ঈমান আনেনি।

যা হোক, অনন্য এই বর্ণনাভঙ্গির ভেতর দিয়েই হযরত মূসা (আ)-র দোয়া মঞ্জুরির বিষয়টিও আলোচিত হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে মহানবী (সা)-র উম্মতদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হলো।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ

عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ
عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

(১৫৭) সে সমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা এমন রসূল নবীয়ে-উম্মীর অনুসরণ করে যাঁর সম্পর্কে নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা রয়েছে (যার এটাও একটা বৈশিষ্ট্য যে), তিনি তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখেন। আর পবিত্র বস্তু সামগ্রীকে তাদের জন্য হালাল ও বৈধ বলে বাতলে দেন (হয়তো-বা সেগুলো পূর্ববর্তী শরীয়তে হারাম ছিল।) এবং অপবিত্র বস্তু সামগ্রীকে (যথারীতি) হারাম বলে অভিহিত করেন। আর (পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধান মতে) যা তাদের উপর বোঝা ও গলবেড়ি (হিসাবে চেপে) ছিল, (অর্থাৎ অতি কঠিন ও জটিল যেসব বিধানের অনুশীলনে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল,) সেগুলো অপসারণ করেন (অর্থাৎ এহেন জটিল ও কঠিন বিধানসমূহ তাঁর শরীয়তে রহিত হয়ে যায়)। অতএব, যারা এই নবীর প্রতি ঈমান আনে, তাঁর সমর্থন ও সাহায্য করে এবং (সেই সঙ্গে) সে নূরেরও অনুসরণ করে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন, তাহলে) এমন লোকেরাই পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভের যোগ্য (এতে তারা অনন্ত আযাব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খাতিমুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) ও তাঁর উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ)-র দোয়ার প্রতিউত্তরে বলা হয়েছিল যে, সাধারণত

আল্লাহ্‌র রহমত তো সমস্ত মানুষ ও বিষয়-সামগ্রীতে ব্যাপক; আপনার বর্তমান উম্মতও তা থেকে বঞ্চিত নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ নিয়ামত ও রহমতের অধিকারী হলো তারাই যারা ঈমান, তাকওয়া-পরহিযগারী ও যাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তসমূহ পূরণ করেন।

এ আয়াতে তাদেরই সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, উল্লিখিত শর্তসমূহের যথার্থ পূরণ-কারী কারা হতে পারে। বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যারা উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র যথাযথ অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-র কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শুধু ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপনই নয়; বরং সেই সাথে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে শরীয়ত ও সুন্নাহ্‌র আনুগত্য-অনুসরণও একান্ত আবশ্যক।

اَلرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ এখানে মহানবী (সা)-র দু'টি পদবী 'রসূল' ও 'নবী'-র সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী'-রও উল্লেখ করা হয়েছে। اُمِّيّ (উম্মী) শব্দের অর্থ হল নিরক্ষর। যে লেখাপড়া কোনটাই জানে না। সাধারণ আরবদের সে কারণেই কোরআন اُمِّيِّيْن (উম্মিয়্যীন) বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল; তবে উম্মী বা নিরক্ষর হওয়াটা কোন মানুষের জন্য প্রশংসনীয় গুণ নয়, বরং ত্রুটি হিসেবেই গণ্য। কিন্তু রসূলে-করীম (সা)-এর জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্ব ও তথ্য অবগতি এবং অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তাঁর পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কেননা, শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোন লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোন একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব-তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে তা তাঁর প্রকৃষ্ট মু'জিযা ছাড়া আর কি হতে পারে---- যা কোন প্রথম শ্রেণীর বিদ্বেষীও অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে মহানবী (সা)-র জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর মক্কা নগরীতে সবার সামনে এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যাতে তিনি কারও কাছে এক অক্ষর পড়েনওনি লেখেনওনি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সকালে সহসা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন বাণীর ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো, যার একটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশের মতো একটি সূরা রচনায় সমগ্র বিশ্ব অপারক হয়ে পড়ল। কাজেই এমতাবস্থায় তাঁর উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া, আল্লাহ্‌ কর্তৃক মনোনীত রসূল হওয়ার এবং কোরআন মজীদের আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

অতএব, উম্মী হওয়া যদিও অন্যদের জন্য কোন প্রশংসনীয় গুণ নয়, কিন্তু মহানবী হযূরে আকরাম (সা)-এর জন্য একটি প্রশংসনীয় ও মহান গুণ এবং পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন মানুষের জন্য যেমন 'অহংকারী' শব্দটি কোন প্রশংসা-বাচক গুণ নয় বরং ত্রুটি বলে গণ্য হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য এটি বিশেষভাবেই প্রশংসাবাচক সিফত।

আলোচ্য আয়াতে মহানবী (সা)-র চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ ইহুদী নাসারারা) আপনার সম্পর্কে তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখবে। এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন মজীদ এ কথা বলেনি যে, 'আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাসমূহ তাতে লেখা পাবে'। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জীলে মহানবী (সা)-র অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য করা স্বয়ং হযূর আকরাম (সা)-কে দেখারই শামিল। আর এখানে তওরাত ও ইঞ্জীলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, বনি ইসরাঈলরা এ দু'টি গ্রন্থকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকত। তা না হলে মহানবী (সা)-র গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা 'যবুর' গ্রন্থেও রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছেন মূসা (আ)। এতে তাঁকে বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ আপনার উম্মতের মধ্যে তারাই পেতে পারবে, যারা উম্মী নবী ও খাতিমুল আম্বিয়া আলায়হিস্সালাতু ওয়াস্ সালামের অনুসরণ করবে। এ বিষয়গুলো তারা তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পাবে।

তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন ঃ বর্তমান-কালের তওরাত ও ইঞ্জীল অসংখ্য রদবদল ও বিকৃতি সাধনের ফলে বিশ্বাসযোগ্য রয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তাতে এমন সব বাক্য ও বর্ণনা রয়েছে, যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কোরআন মজীদ যখন ঘোষণা করেছে যে, শেষ নবীর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনসমূহ তওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, তখন এ কথাটি যদি বাস্তবতা বিরোধী হত, তবে সে যুগের ইহুদী ও নাসারাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক বিরাট হাতিয়ার উপস্থিত হতো যার মাধ্যমে (সহজেই) কোরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারত যে, না, তওরাত ও ইঞ্জীলের কোথাও নবীয়ে উম্মী (সা) সম্পর্কে আলোচনা নেই। কিন্তু তখনকার ইহুদী বা নাসারারা কোরআনের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে কোন পাল্টা ঘোষণা করেনি। এটাই একটা বিরাট প্রমাণ যে, তখনকার তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূল করীম (সা)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বিদ্যমান ছিল, ফলে তারাও ছিল সম্পূর্ণ নীরব-নিশ্চুপ।

খাতিমুন্নাবিয়্যীন (সমস্ত নবীর শেষ নবী) (সা)-এর যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তও-রাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কোরআন মজীদেও করা হয়েছে। আর কিছু সে সমস্ত মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা তওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন সচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে হুযূরে আকরাম (সা)-এর আলোচনা নিজে পড়েই মুসলমান হয়েছেন।

হযরত বায়হাকী (র) 'দালায়েলুন্‌বুয়ত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেছেন যে, কোন এক ইহুদী বালক নবী করীম (সা)-এর খিদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযূর (সা) তার অবস্থা জানার জন্য তশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তওরাত তিলাওয়াত করছে। হুযূর (সা) বললেনঃ হে ইহুদী, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সেই মহান সত্তার, যিনি মূসা (আ)-র উপর তওরাত নাযিল করেছেন, তুমি কি তওরাতে আমার অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোন বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্, তিনি (ছেলেটির পিতা) ভুল বলছেন। তওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রসূল। অতপর হুযূরে আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলমান। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলমানরা করবে। তার পিতার হাতে দেওয়া হবে না।---(মাযহারী)

আর হযরত আলী মুর্তযা (রা) বলেন যে, হুযূর আকরাম (সা)-এর নিকট জনৈক ইহুদীর কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। সে এসে তার ঋণ চাইল। হুযূর (সা) বললেন, এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছু নেই; আমাকে কিছু সময় দাও। ইহুদী কঠোরভাবে তাগাদা করে বলল, আমি আপনাকে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়ব না। হুযূর (সা) বললেন, তোমার সে অধিকার রয়েছে—আমি তোমার কাছে বসে পড়ব। তারপর হুযূর (সা) সেখানেই বসে পড়লেন এবং যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায সেখানেই আদায় করলেন। এমনকি পরের দিন ফজরের নামাযও সেখানেই পড়লেন। বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কিরাম (রা) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং ক্রমাগত রাগান্বিত হচ্ছিলেন; আর ইহুদীকে আস্তে আস্তে ধমকাচ্ছিলেন, যাতে সে হুযূর (সা)-কে ছেড়ে দেয়। হুযূর (সা) বিষয়টি বুঝতে পেরে সাহাবীদের বললেন, একি করছ? তখন তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটা আমরা কেমন করে সহ্য করব যে, একজন ইহুদী আপনাকে বন্দী করে রাখবে? হুযূর (সা) বললেন, "আমার পরওয়ারদিগার কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করতে আমাকে বারণ করেছেন।" ইহুদী এসব ঘটনাই লক্ষ্য করছিল।

ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইহুদী বলল ঃ- أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ছাড়া কোন

উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্‌র রসূল।) এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আর আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরীক্ষা করা যে, তওরাতে আপনার যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান কি, নয়। আমি আপনার সম্পর্কে তওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি ঃ

> মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্‌, তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তাঁর দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেজাযের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে-বাজারে তনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।

পরীক্ষা করে আমি এখন এসব বিষয় সঠিক পেয়েছি। কাজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্যই নেই; আর আপনি হলেন আল্লাহ্‌র রসূল। আর এই হল আমার অর্ধেক সম্পদ। আপনি যেভাবে খুশি খরচ করতে পারেন। সে ইহুদী বহু ধন-সম্পত্তির মালিক ছিল। তার অর্ধেক সম্পদও ছিল এক বিরাট সম্পদ। (বায়হাকী কৃত 'দালায়েলুন্নুবুয়ত' গ্রন্থের বরাত দিয়ে 'তফসীরে মাযহারীতে' ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ইমাম বগভী (র) নিজ সনদে কা'আবে আহ্‌বার (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তওরাতে হুযূর আকরাম (সা) সম্পর্কে লেখা রয়েছে ঃ

> মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর মেজাযের লোক, না বাজে বক্তা। তিনি হাটে-বাজারে হট্টগোল করার লোক নন। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করবেন না, বরং ক্ষমা করে দেবেন এবং ছেড়ে দেন। তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, আর হিজরত হবে তাইবায়, তাঁর দেশ হবে শাম (সিরিয়া)। আর তাঁর উম্মত হবে 'হাম্মাদীন' অর্থাৎ আনন্দ-বেদনা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তারা যে কোন উর্ধ্বারোহণকালে তকবীর বলবে। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে সময় নির্ণয় করে যথাসময় নামায পড়তে পারে। তিনি তাঁর শরীরের নিম্নাংশে 'তহবন্দ' (লুঙ্গি) পরবেন এবং হস্ত-পদাদি ওযূর মাধ্যমে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তাঁদের আযানদাতা আকাশে সুউচ্চ স্বরে আহবান করবেন। জিহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে যেমন নামাযে হয়ে থাকে। রাতের বেলায় তাদের তিলাওয়াত ও যিকিরের শব্দ এমনভাবে উঠতে থাকবে, যেন মধুমক্ষিকার শব্দ। ---(মাযহারী)

ইবনে সা'আদ ও ইবনে আসাকির (র) হযরত সাহাল মওলা খাইসামা (রা) থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত সাহাল বলেন, আমি নিজে ইঞ্জীলে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পড়েছি ঃ

তিনি খুব বেঁটেও হবেন না, আবার খুব লম্বাও হবেন না। উজ্জ্বল বর্ণ ও দু'টি কেশ-গুচ্ছধারী হবেন। তাঁর দু'টি কাঁধের মধ্যস্থলে নবুয়তের মোহর থাকবে। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। গাধা ও উটের উপর সওয়ারী করবেন। ছাগলের দুধ নিজে দুইয়ে নেবেন। তালি লাগানো জামা পরবেন। আর যারা এমন করে তারা অহঙ্কার মুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর হবেন। তাঁর নাম হবে আহ্মদ।

আর ইবনে সা'আদ, দারেমী ও বায়হাকী যথাক্রমে তাব্কাত, মাস্নাদ ও 'দালায়েলুন্নুবুয়ত' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন; যিনি ছিলেন ইহুদীদের সবচেয়ে বড় আলিম এবং তওরাতের সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ, তিনি বলেছেন যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে ঃ

হে নবী, আমি আপনাকে সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী, সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদদাতা, অসৎকর্মীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মিয়্যীন অর্থাৎ আরবদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' রেখেছি। আপনি কঠোর মেজাযীও নন, দাঙ্গাবাজও নন। হাটে-বাজারে হট্টগোলকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে মৃত্যু দেবেন না, যতক্ষণ না আপনার মাধ্যমে বাঁকা জাতিকে সোজা করে নেবেন। এমনকি যতক্ষণ না তারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই)-এর মন্ত্রে স্বীকৃত হয়ে যাবেন, যতক্ষণ না অন্ধ চোখ খুলে দেবেন, বধির কান যতক্ষণ না শোনার যোগ্য বানাবেন এবং বদ্ধ হৃদয় যতক্ষণ না খুলে দেবেন।

এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্র ইবনে আস্ (রা) থেকে বোখারী শরীফেও উদ্ধৃত হয়েছে।

আর প্রাচীন গ্রন্থ-বিশারদ আলিম হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (রা) থেকে ইমাম বায়হাকী তাঁর দালায়েলু ন্নুবুয়ত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা যবুর কিতাবের মধ্যে হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেন যে, হে দাউদ, আপনার পরে একজন নবী আসবেন, যাঁর নাম হবে 'আহ্মদ'। আমি তাঁর প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হবো না এবং তিনি কখনও আমার না-ফরমানী করবেন না। আমি তাঁর গত-আগত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি। তাঁর উম্মত হল দয়াকৃত উম্মত (উম্মতে মরহুমাহ্)। আমি তাদেরকে সে সমস্ত নফল বিষয় দান করছি, যা পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অপরিহার্য করেছিলাম। এমনকি তারা হাশরের দিনে আমার সামনে এমন

অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তাদের নূর আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালামের নূরের মত হবে। হে দাউদ, আমি মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর উম্মতকে সমস্ত উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আমি তাদেরকে বিশেষভাবে ছটি বিষয় দিয়েছি, যা অন্য কোন উম্মতকে দিইনি। ১. কোন ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাদের কোন শাস্তি হবে না। ২. অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে যদি সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। ৩. যে মাল সে পবিত্র মনে আল্লাহ্র রাহে খরচ করবে, আমি দুনিয়াতেই তাকে তা থেকে বহুগুণ বেশি দিয়ে দেব। ৪. তাদের উপর কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে যদি তারা إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়ে, তবে আমি তাদের জন্য এ বিপদকে করুণা ও রহমত এবং জান্নাতের দিকে পথনির্দেশে পরিণত করে দেব। (৫-৬) তারা যে দোয়া করবে আমি তা কবুল করব, কখনও যা চেয়েছে তাই দান করে, আর কখনও এই দোয়াকেই তাদের আখিরাতের পাথেয় করে দিয়ে।—(রাহুল মা'আনী)

শত শত আয়াতের মধ্যে এ কয়টি রেওয়ায়েত তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুর-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হলো। সমগ্র রেওয়ায়েতসমূহ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

তওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত শেষনবী (সা) ও তাঁর উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলিম মনীষীবৃন্দ স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বর্তমান যমানায় হযরত মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কীরানভী মুহাজিরে-মক্কী (র) তাঁর গ্রন্থ 'ইযহারুল-হক'-এ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জীল, যাতে সীমাহীন বিকৃতি সাধিত হয়েছে, তাতেও মহানবীর বহু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে মহানবী (সা)-র সে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের সবিস্তার আলোচনা ছিল যা তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুরে লেখা ছিল। আয়াতে হুযূরে আকরাম (সা)-এর কিছু অতিরিক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য আলোচিত হচ্ছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম গুণটি হল, সৎ কাজের উপদেশ দান ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত করা। مَعْرُوف (মা'রূফ)-এর শব্দার্থ হলো জানাশোনা, প্রচলিত। আর مُنْكَر (মুনকার) অর্থ অজানা, বহিরাগত, যা চেনা যায় না। এক্ষেত্রে 'মা'রূফ' বলতে সেসব সৎকাজকে বোঝানো হয়েছে, যা ইসলামী শরীয়তে জানাশোনা ও প্রচলিত। আর 'মুনকার' বলতে সেসব মন্দ ও অসৎ কাজ, যা শরীয়তবহির্ভূত।

এখানে সৎ কাজসমূহকে مَعْرُوْف (মা'রূফ) এবং মন্দ ও অন্যায় কাজসমূহকে مُنْكَر (মুন্‌কার) শব্দের মাধ্যমে বোঝাতে গিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দীনে-ইসলামের দৃষ্টিতে সৎ কাজ শুধু সেই সমস্ত কাজকেই বলা যাবে, যা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত ছিল এবং যা এরূপ হবে না, সেটাকে 'মুনকার' অর্থাৎ অসৎ কাজ বলা হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবেয়ীন (র) যেসব কাজকে সৎ কাজ বলে মনে করেন নি, সে সমস্ত কাজ যতই ভাল মনে হোক না কেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে সেগুলো ভাল কাজ নয়। এ জন্যই সহী হাদীসসমূহে সে সমস্ত কাজকেই কুসংস্কার ও বিদ্'আত সাব্যস্ত করে গোমরাহী বলা হয়েছে। যার শিক্ষা মহানবী (সা) সাহাবায়ে কিরাম কিংবা তাবেইনদের কাছ থেকে আসেনি। আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটির অর্থ হলো এই যে, হুযূর (সা) মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেবেন এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবেন।

এ গুণটি যদিও সমস্ত নবী (আ)-এর মধ্যেই ব্যাপক এবং হওয়া উচিতও বটে——। কারণ প্রত্যেক নবী ও রসূলকে এ কাজের জন্যই পাঠানো হয়েছে যে, তাঁরা মানুষকে সৎকাজের প্রতি পথানির্দেশ করবেন এবং অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করবেন, কিন্তু এখানে রসূলে করীম (সা)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এর বর্ণনা করাতে সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী (সা)-কে এ গুণটিতে অন্যান্য নবী-রসূল অপেক্ষা কিছুটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। আর এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত হওয়ার কারণ একাধিক। প্রথমত এ কাজের সেই বিশেষ প্রক্রিয়া যাতে প্রতিটি শ্রেণীর লোককে তাদের অবস্থার উপযোগী পদ্ধতিতে বোঝানো, যাতে করে প্রতিটি বিষয় তাদের মনে বসে যায়; কোন বোঝা বলে মনে না হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে এ বিষয়ে অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার অধিকারী করেছিলেন। আরবের যে মরুবাসীরা উট, আর ছাগল চরানো ছাড়া কিছুই জানত না, তাদের সাথে তিনি তাদের বোধগম্য আলোচনা করতেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানগত বিষয়কেও এমন সরল-সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন, যাতে অশিক্ষিত মূর্খজনেরও তা হৃদয়ঙ্গম করতে কোন অসুবিধা না হয়। আবার অপরদিকে কায়সার ও কিস্‌রা হেন অনারব সম্রাট এবং তাদের পাঠানো বিজ্ঞ ও পণ্ডিত দূতদের সাথে তাদেরই যোগ্য আলোচনা চলত। অথচ সবাই সমানভাবে তাঁর সে আলোচনায় প্রভাবিত হত। দ্বিতীয়ত হুযূর আকরাম (সা) ও তাঁর বাণীর মাঝে আল্লাহ্-প্রদত্ত জনপ্রিয়তা এবং মানব মনের গভীরতম প্রদেশে প্রভাব বিস্তারের একটা মু'জিযাসুলভ ধারা ছিল। বড়র চেয়ে বড় শত্রুও যখন তাঁর বাণী শুনত, তখন প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারত না।

উপরে তওরাতের উদ্ধৃতিতে রসূলে করীম (সা)-এর যে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল, তাতে এ কথাও ছিল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাধ্যমে

অন্ধ চোখে আলো এবং বধির কানে শ্রবণশক্তি দান করবেন; আর বন্ধ অন্তরাত্মাকে খুলে দেবেন। রসূলে করীম (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা امر بالمعروف (সৎ কাজের নির্দেশ দান) এবং نهى عن المنكر (অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা)-এর জন্য যে অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন এ সব গুণও হয়ত তারই ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা) মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু-সামগ্রী হালাল করবেন; আর পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করবেন অর্থাৎ অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী যা শাস্তিস্বরূপ বনি ইসরাঈলদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, রসূলে করীম (সা) সেগুলোর উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেবেন! উদাহরণত পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনি ইসরাঈলদের অসদাচরণের শাস্তি হিসাবে হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, মহানবী (সা) সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে রক্ত, মৃত পশু, মদ্য ও সমস্ত হারাম জন্তু অন্তর্ভুক্ত এবং যাবতীয় হারাম উপায়ের আয় যথা, সূদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত।—(আস্‌সিরাজুল-মুনীর) কোন কোন মনীষী মন্দ চরিত্র ও অভ্যাসকেও পঙ্কিলতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ মহানবী (সা) মানুষের উপর থেকে সেই বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দেবেন, যা তাদের উপর চেপে ছিল।

"اصر" (ইসর) শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা, যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর اغلال (আগলাল) غُلٌّ -এর বহুবচন। 'গুল্লুন' সে হাতকড়াকে বলা হয় যদ্দ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হয় এবং সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে।

اِصْرٌ (ইসর) ও اَغْلَالٌ (আগলাল) অর্থাৎ অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা বলতে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি-বিধানকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একান্ত শাস্তি হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, কাপড় নাপাক হয়ে গেলে পানিতে ধুয়ে ফেলা বনি ইসরাঈলদের জন্য যথেষ্ট ছিল না; বরং যে স্থানটিতে অপবিত্র বস্তু লেগেছে সেটুকু কেটে ফেলা ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। আর বিধর্মী কাফিরদের সাথে জিহাদ করে গনীমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনি ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল

না, বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। কোন অঙ্গ দ্বারা কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সেই অঙ্গটি কেটে ফেলা ছিল অপরিহার্য ওয়াজিব। কারো হত্যা, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, উভয় অবস্থাতেই হত্যাকারীকে হত্যা করা ছিল ওয়াজিব, খুনের ক্ষতিপূরণের কোন বিধানই ছিল না।

এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধান যা বনি ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কোরআনে সেগুলোকে 'ইস্‌র' ও 'আগলাল' বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) এসব কঠিন বিধি-বিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ বিধি-বিধান প্রবর্তন করবেন।

এক হাদীসে মহানবী (সা) এ বিষয়টিই বলেছেন, আমি তোমাদের একটি সহজ ও সাবলীল শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাতে না আছে কোন পরিশ্রম, না পথভ্রষ্টতার কোন ভয়ভীতি।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, اَلدِّيْنُ يُسْرٌ অর্থাৎ ধর্ম সহজ। কোরআন করীম বলেছে ঃ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেন নি।

উম্মী নবী (সা)-র বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পর বলা হয়েছে ঃ

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী নবী (সা)-র প্রকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেওয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে—অর্থাৎ যারা কোরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হল কল্যাণপ্রাপ্ত।

এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথমত মহানবী (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনা, দ্বিতীয়ত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তৃতীয়ত তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করা এবং চতুর্থত কোরআন অনুযায়ী চলা।

শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বুঝাবার জন্য عَزَّرُوهُ (আয্যারূহু) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تَعْزِيْر থেকে উদ্ভূত। تَعْزِيْر (তা'যীর) অর্থ সস্নেহে বারণ করা ও রক্ষা করা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) عَزَّرُوهُ (আয্যারূহু)-এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা সম্মান করা। মুবাররাদ বলেছেন যে, উচ্চতর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে বলা হয় تعزير (তা'যীর)।

তার অর্থ, যারা মহানবী (সা)-র প্রতি যথাযথ সম্মান ও মহত্ত্ববোধ-সহকারে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন করবে এবং বিরোধীদের মুকাবিলায় তাঁর সহায়তা করবে, তারাই হবে পরিপূর্ণ কৃতকার্য ও কল্যাণপ্রাপ্ত। নবী করীম (সা)-এর জীবৎকালে সাহায্য ও সমর্থনের সম্পর্ক ছিল স্বয়ং তাঁর সত্তার সাথে। কিন্তু হুযূর (সা)-এর তিরোধানের পর তাঁর শরীয়ত এবং তাঁর প্রবর্তিত দীনের সাহায্য-সমর্থনই হলো মহানবীর সাহায্য-সমর্থনের শামিল।

এ আয়াতে কোরআন করীমকে 'নূর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, 'নূর' বা জ্যোতির পক্ষে জ্যোতি হওয়ার জন্য যেমন কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই, বরং সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনিভাবে কোরআন করীমও নিজেই আল্লাহ্র কালাম ও সত্যবাণী হওয়ার প্রমাণ যে, একজন একান্ত উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে এমন উচ্চতর সালঙ্কার বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম বেরিয়েছে, যার কোন উপমা উপস্থাপনে সমগ্র বিশ্ব অপারক হয়ে পড়েছে। এটা স্বয়ং কোরআন করীমের আল্লাহ্র কালাম হওয়ারই প্রমাণ।

তদুপরি নূর যেমন নিজেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং অন্ধকারকে আলোময় করে দেয়, তেমনিভাবে কোরআন করীমও ঘোর অন্ধকারের আবর্তে আবদ্ধ পৃথিবীকে আলোতে নিয়ে এসেছে।

কোরআনের সাথে সাথে সুন্নাহ্র অনুসরণও ফরয ঃ এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে ঃ- يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ -এর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ- وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ -এর প্রথম বাক্যে 'উম্মী নবী'র অনুসরণ এবং পরবর্তী বাক্যে কোরআনের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আখিরাতের মুক্তি কোরআন ও সুন্নাহ দুটিরই অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। কারণ উম্মী নবীর অনুসরণ তাঁর সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

শুধু রসূলের অনুসরণই নয়; বরং মুক্তির জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান এবং মহব্বত থাকাও ফরয: উল্লিখিত বাক্য দু'টির মাঝে عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ শীর্ষক দু'টি শব্দ সংযোজন করে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী (সা) কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানের এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়, যেমন সাধারণত দুনিয়ার শাসকদের বাধ্যতা-মূলকভাবে করতে হয় বরং অনুসরণ বলতে এমন অনুসরণই উদ্দেশ্য যা হবে মহত্ত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসার ফলশ্রুতি অর্থাৎ অন্তরে হুযূরে-আকরাম (সা)-এর মহত্ত্ব ও ভালবাসা এত অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তাঁর বিধি-বিধানের অনু-সরণে বাধ্য হতে হয়। কারণ উম্মতের সম্পর্ক থাকে নিজ রসূলের সাথে বিভিন্ন রকম। একেতো তিনি হলেন আজ্ঞাদানকারী মনিব, আর উম্মত হচ্ছে আজ্ঞাবহ প্রজা। দ্বিতীয়ত তিনি হলেন প্রেমাস্পদ, আর উম্মত হচ্ছে প্রেমিক।

এদিকে রসূলে-করীম (সা) জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপনকারী একক মহত্ত্বের আধার; আর সে তুলনায় সমগ্র উম্মত হচ্ছে একান্তই হীন ও অক্ষম।

আমাদের পেয়ারা নবী (সা)-র মাঝে যাবতীয় মহত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, কাজেই তাঁর প্রতিটি মহত্ত্বের দাবি পূরণ করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রসূল হিসেবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে, মনিব ও হাকেম হিসেবে তাঁর প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে, প্রিয়জন হিসেবে তাঁর সাথে গভীরতর প্রেম ও ভাল-বাসা রাখতে হবে এবং নবুয়তের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ, তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনুগত্য ও অনুসরণ তো উম্মতের উপর ফরয হওয়াই উচিত। কেননা, এছাড়া নবী-রসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন আমাদের রসূলে-মকবুল (সা) সম্পর্কে শুধু আনুগত্য অনু-সরণের উপর ক্ষান্ত করেননি; বরং উম্মতের উপর তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করাকেও অবশ্য কর্তব্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। উপরন্তু কোরআনে-করীমের বিভিন্ন স্থানে তাঁর রীতি-নীতির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতে عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ বাক্যে সেদিকেই হিদায়ত দান করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে: — تُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ অর্থাৎ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাঁকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর। এ ছাড়া আরও কয়েকটি আয়াতে এই হিদায়ত দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী (সা)-র উপস্থিতিতে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, যা তাঁর স্বর হতে বেড়ে যেতে পারে। বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ

يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল থেকে এগিয়ে যেও না, অর্থাৎ যদি মজলিসে হুযূর আকরাম (সা) উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাঁর আগে কোন কথা বলো না।

হযরত সাহ্ল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে, হুযূর (সা)-এর পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোন কথা বলেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে।

কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা)-কে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমনভাবে ডাকবে না, নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। বলা হয়েছে ঃ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ

بَعْضِكُمْ بَعْضًا এ আয়াত শেষে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের বরখিলাফ কোন অসম্মানজনক কাজ করা হলে সমস্ত সৎকর্ম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে।

এ কারণেই সাহাবায়ে-কিরাম রিয্ ওয়ানুল্লাহি আলাইহিম যদিও সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় মহানবী (সা)-র কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে; তবুও তাঁদের অবস্থা এই ছিল যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) যখন মহানবী (সা)-র খিদমতে কোন বিষয় নিবেদন করতেন, তখন এমনভাবে বলতেন যেন কোন গোপন বিষয় আস্তে আস্তে বলছেন। এমনি অবস্থা ছিল হযরত ফারূকে আযম (রা)-এরও। —(শেফা)

হযরত আমর ইবনুল্ আ'স (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) অপেক্ষা আমার কোন প্রিয়জন সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি হুযূর আকরাম (সা)-এর আকার-অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায়, তাহলে তা বলতে আমি এ জন্য অপারক যে, আমি কখনও তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, সাহাবীদের মজলিসে যখন হুযূর আকরাম (সা) তশরীফ আনতেন তখনই সবাই

নিম্নদৃষ্টি হয়ে বসে থাকতেন। শুধু সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রা) তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতেন; আর তিনি তাঁদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসতেন।

ওরওয়া ইবনে মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য মদীনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে হুযূর (সা)-এর প্রতি এমন নিবেদিতপ্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল; "আমি কিস্‌রা ও কায়সারের দরবারও দেখেছি এবং সম্রাট নাজ্জাশীর সাথেও সাক্ষাত করেছি। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীদের যে অবস্থা আমি দেখেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা, তোমরা কস্মিনকালেও তাদের মুকাবিলায় জয়ী হতে পারবে না।"

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হুযূর আকরাম (সা) যখন ঘরের ভিতর অবস্থান করতেন, তখন তাঁকে বাইরে থেকে সশব্দে ডাকাকে সাহাবায়ে কিরাম বে-আদবী মনে করতেন। দরজায় কড়া নাড়তে হলেও শুধু নখ দিয়ে টোকা দিতেন যাতে বেশি জোরে শব্দ না হয়।

মহানবী (সা)-র তিরোধানের পরও সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিল যে, মসজিদে-নববীতে কখনও জোরে কথা বলা তো দূরের কথা, কোন ওয়াজ কিংবা বয়ান বিবৃতিও উচ্চৈঃস্বরে করা পছন্দ করতেন না। অধিকাংশ সাহাবী (রা)-র এমনি অবস্থা ছিল যে, যখনই কেউ হুযূর আকরাম (সা)-এর পবিত্র নাম উল্লেখ করতেন, তখনই কেঁদে উঠতেন এবং ভীত হয়ে পড়তেন।

এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বরকতেই তাঁরা নবুয়তী ফয়েয থেকে বিশেষ উত্তরাধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনও এ কারণেই তাঁদেরকে আম্বিয়া (আ)-এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝١٥٨ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝١٥٩

(১৫৮) বলে দাও হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রসূল,—সমগ্র আসমান ও যমীনে তাঁর রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর

কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ্‌র এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরলপথ প্রাপ্ত হতে পার। (১৫৯) বস্তুত মূসার সম্প্রদায়ে একটি দল রয়েছে যারা সত্যপথ নির্দেশ করে এবং সে মতেই বিচার করে থাকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন, হে (দুনিয়া-জাহানের) মানুষ আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রসূল যাঁর সাম্রাজ্য সমগ্র আকাশসমূহ ও পৃথিবীসমূহে (বিস্তৃত)। তাঁকে ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন। কাজেই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর উম্মী নবীর প্রতিও (ঈমান আন)। তিনি নিজেও আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁর নির্দেশাবলীর উপর ঈমান রাখেন। (অর্থাৎ এহেন মহান মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যখন আল্লাহ্ বিগত সমস্ত নবী-রসূল ও কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনতে তাঁর এতটুকু সংকোচবোধ হয় না, তখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনতে তোমাদের এ অস্বীকৃতি কেন?) আর তাঁর (অর্থাৎ নবীর) অনুসরণ কর, যাতে তোমরা (সরল) পথে আসতে পার। বস্তুত (কেউ কেউ যদিও তাঁর বিরোধিতা করেছে, কিন্তু) মূসা (আ)-র সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্য-সনাতন ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম)-এর সপক্ষে (মানুষকে) হিদায়ত করে এবং সে অনুযায়ীই (নিজেদের ও অন্যদের ব্যাপারে) বিচার-মীমাংসাও করে। (এর লক্ষ্য হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রিসালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, আমাদের রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জ্বিন ও মানবজাতি তথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক।

এ আয়াতে রসূলে করীম (সা)-কে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি মানুষকে বলে দিন আমি তোমাদের সবার প্রতি নবী-রূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার নবুয়ত লাভ ও রিসালত প্রাপ্তি বিগত নবীদের মত কোন বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূখণ্ড অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য, বিশ্বের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য—কিয়ামতকাল পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত। আর মানব জাতি ছাড়াও এতে জ্বিন জাতিও অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী (সা)-র নবুয়ত কিয়ামতকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তাই তাঁর উপরই নবুয়তের ধারাও সমাপ্তঃ নবুয়ত সমাপ্তির এটাই হল প্রকৃত রহস্য। কারণ, মহানবী (সা)-র নবুয়ত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নবী বা রসূলের আবির্ভাবের না কোন প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে, না তার কোন অবকাশ আছে। আর এই হল মহানবীর উম্মতের সে বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত রহস্য যে, নবী করীম (সা)-এর ভাষায় এতে সর্বদাই এমন একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা ধর্মের মাঝে সৃষ্ট যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদের মুকাবিলা করবেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্ট সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে থাকবেন। কোরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এদল সেগুলোরও অপনোদন করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সাহায্য ও সহায়তাপ্রাপ্ত হবে, যার ফলে তারা সবার উপরই বিজয়ী হবে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এ দলটি হবে মহানবী (সা)-র রিসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত---(নায়েব)।

ইমাম রাযী (র) كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতে এই ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে যে, এই উম্মতের মধ্যে 'সাদেকীন' অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠদের একটি দল অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে। তা না হলে বিশ্ববাসীর প্রতি সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকার নির্দেশই দেওয়া হতো না। আর এরই ভিত্তিতে ইমাম রাযী (র) সর্বযুগে এজমায়ে-উম্মত বা মুসলমান জাতির ঐকমত্যকে শরীয়তের দলীল বলে প্রমাণ করেছেন। তার কারণ, সত্যনিষ্ঠ দলের বর্তমানে কোন ভুল বিষয় কিংবা কোন পথভ্রষ্টতায় সবাই ঐকমত্য বা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।

ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেছেন যে, এ আয়াতে মহানবী (সা)-র খাতা-মুন্নাবিয়্যীন বা শেষনবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ হুযূর (সা)-এর আবির্ভাব ও রিসালত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নতুন রসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। সেজন্যই শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আ) যখন আসবেন, তখন তিনিও যথাস্থানে নিজের নবুয়তে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা) কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তের উপরই আমল করবেন। [হুযূরে আকরাম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নিজস্ব যে শরীয়ত ছিল, তাকে তখন তিনিও রহিত বলেই গণ্য করবেন।] বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত দ্বারা তাই প্রতীয়মান হয়।

রসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর রিসালত যে কিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপক, এ আয়াতটি তো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছেই---তাছাড়া কোরআন মজীদে আরও কতিপয় আয়াত তার প্রমাণ বহন করে। যেমন বলা হয়েছে ঃ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ-

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ অর্থাৎ আমার প্রতি এই কোরআন ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করি এবং তাদেরকেও ভীতিপ্রদর্শন করি যাদের কাছে এ কোরআন পেঁছিবে আমার পরে। [অর্থাৎ হুযুর (সা)-এর তিরোধানের পরে।]

মহানবী (সা)-র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঃ ইবনে কাসীর মস্‌নদে আহমদ গ্রন্থের বরাত দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন যে, গয্‌ওয়ায়ে-তাবুকের (তাবুক যুদ্ধের) সময় রসূলে-করীম (সা) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের ভয় হচ্ছিল যে, শত্রুরা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তাঁরা হুযুর (সা)-এর চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। হুযুর (সা) নামায শেষ করে ইরশাদ করলেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোন নবী রসূলকে দেওয়া হয়নি। তার একটি হল এই যে, আমার রিসালত ও নবুয়তকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রসূলই এসেছেন, তাঁদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত আমাকে আমার শত্রুর মুকাবিলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। তৃতীয়ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে-গনীমত আমার জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না। বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হত। তাদের গনীমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে খাক করে দিয়ে যাবে। চতুর্থত আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমাদের নামায যে কোন জমি, যে কোন জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোন বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের ইবাদত শুধু তাদের উপাসনা-লয়েই হতো, অন্য কোথাও নয়। নিজেদের ঘরে কিংবা মাঠে-ময়দানে তাদের নামায বা ইবাদত হত না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্যও না থাকে তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোন রোগ-শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেওয়াই পবিত্রতা ও অযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতপর বললেন, আর পঞ্চমটির কথা তো বলতেই নেই, তা নিজেই নিজের উদাহরণ, একেবারে অনন্য। তা হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক রসূলকে একটি দোয়া কবুল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রসূলই তাঁদের নিজ নিজ দোয়াকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হলো আপনি কোন একটা দোয়া করুন। আমি আমার দোয়াকে আখিরাতের

জন্য সংরক্ষিত করিয়ে নিয়েছি। সে দোয়া তোমাদের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্ম হবে, তাদের কাজে লাগবে।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে উদ্ধৃত ইমাম আহ্মদ (র)-এর এক রিওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে, তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী-খৃস্টান হোক, যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে, তাহলে জাহান্নামে যাবে।

আর সহীহ বুখারী শরীফে এ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আবূ দার্দা (রা)-এর রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর মধ্যে কোন এক বিষয়ে মতবিরোধ হয়। তাতে হযরত উমর (রা) নারায হয়ে চলে যান। তা দেখে হযরত আবূ বকর (রা)-ও তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু হযরত উমর (রা) কিছুতেই রাযী হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পেঁৗছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং মহানবী (সা)-র দরবারে গিয়ে হাযির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই হযরত উমর (রা) নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে যান এবং তিনিও ঘর থেকে বেরিয়ে মহানবী (সা)-র দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। হযরত আবূ দার্দা (রা) বলেন যে, এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত আবূ বকর (রা) যখন লক্ষ্য করলেন যে, হযরত উমর (রা)-এর প্রতি ভর্ৎসনা করা হচ্ছে, তখন নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, দোষ আমারই বেশি। রসূলে করীম (সা) বললেন, আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে আমি যখন বললাম ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে, শুধু এই আবূ বকর (রা)-ই ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রতিটি দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রতিটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী (সা)-র ব্যাপকভাবে রসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হুযূরে-আকরাম (সা)-এর আবির্ভাবের পর যে লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না সে লোক কোন সাবেক শরীয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোন ধর্ম ও